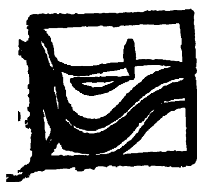
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

[M. BLACKER FREEMAN এর
THE LIFE OF EINSTEIN অবলম্বনে]

মোহাম্মদ নাসির আলী

মুক্তধারা



মুক্তধারা ৪১৩

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢকা—১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুর রউফ সরকার

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

এক

"ছেলেটা নিরেট বোকা।"

প্রাইমারী ক্লাসে ছোট্ট একটি ছেলে চুপচাপ বসে আছে কোলের উপর দু'হাত গুটিয়ে রেখে। তাকেই দেখিয়ে শিক্ষক বললেন, "ছেলেটা নিরেট বোকা। সহজ একটা জিনিসও বুঝতে পারে না। চেয়েই দেখো ওর দিকে।"

ক্লাসের সবাই আইনস্টাইনের দিকে চোখ ফেরাল। বড় ছেলেদের অনেকের মুখেই চাপা হাসি। শিক্ষক বলতে লাগলেন, "তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, অ্যালবার্ট। চট্‌পট্‌ জবাব দাও।"

আইনস্টাইন একটুও নড়লেন না, এমন কি সে যে শুনতে পেয়েছে তাও বোঝা গেল না। মনে হল শিক্ষক যেন আর কাউকে কিছু বলছেন।

ক্লাসের সবাই চুপচাপ। লম্বা একটি ঘর, বেশ ঠাণ্ডা। এক পাশের কাচের জানালা ভেদ করে সূর্যের ধূসর আলো এসে পড়েছে ঘরে। ছেলেদের মধ্যে একটু উত্তেজনার ভাব। আইনস্টাইনকে আবার শাস্তি দেওয়া হবে। তারা মনে মনে বেশ খুশী কারণ তাকে তারা পছন্দ করে না। কাজের ফাঁকে তারা একটু আনন্দ গেল।

শিক্ষকটি বেশ মোটাসোটা। তাঁর ঘাড়টিও মোটা কিন্তু মাথাটি ছোট। আরও ছোট দেখাচ্ছে মাথার চুল সব কামিয়ে ফেলা হয়েছে বলে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে হুকুম দিলেন, "দাঁড়াও! দাঁড়িয়ে হলকামরায় হেটে যাও। দুপুর অবধি সেখানে থাকবে।"

আইনস্টাইন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বেতের পিটুনি খাওয়ার চেয়ে এ সাজা বরং ভাল। হলকামরাটা খুব ঠাণ্ডা। দু'ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ কাজ নয়। তবু আজেবাজে সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ক্লাসে বসে থাকার চেয়ে এখানে থাকা ঢের ভাল।

অ্যালব্যার্ট আইনস্টাইন ইচ্ছে করে কখনো অবাধ্যতা করেন নি। তিনি তাড়াতাড়ি কোন কথার জবাব দিতে পারতেন না। যা কিছু তিনি বলতেন বলবার আগে অনেক ভেবেচিন্তে বলতেন। তাতে কিছু সময় ব্যয় হ'ত। শিক্ষক অধৈর্য হয়ে যেতেন এবং ভেবেচিন্তে বলার চেয়ে চট্‌পট্‌ যারা জবাব দিতে পারত তাদের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতেন। কিন্তু অ্যালবার্টের জন্য কথা বলাটাই যেন ছিল মুশকিলের ব্যাপার। তাঁর মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ত অতি ধীরে এলোমেলোভাবে।

জার্মানীর মিউনিক শহরের উপকণ্ঠে ছিল এই স্কুলটি। মিউনিকের চুরাশি মাইল পশ্চিমে উল্‌ম শহর। ছয় বছর আগে, ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনের এই শহরে জন্ম হয়। বয়স যখন তাঁর এক বছর তখন তাঁর মা-বাবা এই বড় শহর মিউনিকে চলে আসেন।

মিউনিক শহরটা জার্মানীর দক্ষিণ অঞ্চল ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত। এক সময়ে হাজার বছরের জন্য ব্যাভেরিয়া ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের রাজাও ছিলেন। অ্যালবার্টের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাভেরিয়া স্বাধীনতা ত্যাগ করে প্রুশিয়া ও অপরাপর জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করে নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে।

প্রুশিয়ার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন অটো ভন বিসমার্ক। তিনি শক্তিশালী গভর্নমেন্টে বিশ্বাস করতেন কিন্তু গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না। এ জন্য তাঁকে বলা হত 'রক্তলৌহ মানব'। তিনি আরামপ্রিয় ব্যাভেরিয়ানদের বাধ্য করেন প্রুশিয়ানদের মত জীবন যাপন করতে। তাদের মত শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও কর্তৃপক্ষের প্রতি অটল সম্মান বজায় রাখতে। নতুন নিয়মের আওতায় এসে স্কুলগুলো হল সামরিক মেশিনের মত। তার শিক্ষকরা সার্জেন্টের তুল্য আর সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা সামরিক ঘাঁটির মত।

আইনস্টাইন সেই ঠাণ্ডা হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখান থেকেই শোনা যাচ্ছে, শিক্ষকের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ছেলেরা লাফ দিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং চট্‌পট্‌ জবাব দিচ্ছে।

আহা, স্কুলের চেয়ে বাড়ীতে থাকা কত আরামের। বাড়ীর ব্যাপারই ভিন্ন। অ্যালবার্টের চার বছর বয়সের বোন মায়া এসে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, মা গরম গরম খাবার বেড়ে দেন পুরানো আমলের সেই আরামপ্রদ বড় রান্নাঘরে। চার পাশে বাগান ঘেরা কি

চমৎকার বাড়ীটি তাঁদের। কয়েদীর মত সারাটা দিন স্কুলে কাটিয়ে এসে বাড়ীটা এই ছেলেটির কাছে সত্যিই এক আজব জায়গা বলে মনে হয়।

ছেলে অ্যালবার্টকে তাঁর বাবা হেরমান আর মা পলিন খুব ভালবাসেন যদিও ছেলের এই মন্থর ভাব দেখে সময় সময় তাঁরা গোপনে কিছু চিন্তা করেন তবু তাঁরা ধৈর্যহারা হন না। ছেলেটা কথা বলতেও শিখেছে ধীরে ধীরে। তা'ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দ পায় তেমন কিছুর দিকেই অ্যালবার্টের কোন আগ্রহ নেই। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ছেলে। অন্য ছেলেমেয়েরা যখন বাগানে গিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলাধুলোয় মেতে থাকত আইনস্টাইন তখন একা একা দূরে গিয়ে থাকতে পছন্দ করতেন।

পরিবারের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁর জীবন বেশ সুখেরই ছিল। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। মামা, খালা, ফুফু, খালাতো ফুফাতো ভাইবোন প্রভৃতি মেহ্‌মানে বাড়ী তাঁদের প্রায়ই ভর্তি থাকত। সপ্তাহের শেষে প্রায়ই তাঁরা বেড়াতে যেতেন ধারে কাছে কোন পাহাড়ে অথবা ব্যাভেরিয়ার হ্রদ অঞ্চলে। কোন কোন সময় তাঁরা গ্রাম্য কোন সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিতেন। অ্যালবার্ট সেখানে তাঁর পছন্দ-মত খাবারের ফরমায়েশ দিতেন।

এসব অভিযানে গিয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন, কারণ গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। বনের ভেতর গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বেরিয়ে আসে ছবির মত। সে সব বনের পাশ দিয়ে হাঁটতে তাঁর মন ভরে উঠত খুশীতে। সময় সময় গাছের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাজ্জব হয়ে তিনি তার নির্মাণ কৌশল দেখতেন। অনেকক্ষণ ধরে হ্রদের পারে আপন মনে চুপচাপ বসে থাকতেন ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে চেয়ে আর আঁধার রাত্তিরে চেয়ে থাকতেন আকাশের তারার দিকে।

একদিন তাঁরা চড়াইভাতি করতে গিয়েছিলেন আইসার নদীর তীরে। অ্যালবার্টের চাচা রাডি বলছিলেন, "চেয়ে দেখো ছেলেমেয়েগুলো কেমন হেসে খেলে হৈ চৈ করছে, একে অপরকে কেমন ত্যক্ত করছে। আর অ্যালবার্টের দিকে চেয়ে দেখো কেমন গুরুগম্ভীর। আমাদের এলসাও তার বয়সী কিন্তু সে কেমন হাসিখুশী। কিন্তু

অ্যালব্যার্ট তার ধারে-কাছেও নয়। সে চুপটি করে বসে একমনে চেয়ে থাকে লেকের ওপারের দিকে।"

আইনস্টাইনের মা পলিন আইনস্টাইন সব সময়েই ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন। তিনি বলে উঠলেন, "ও, চুপচাপ বসে কিছু চিন্তা করছে। সবুর করো তোমরা, দেখবে কালে ও একজন অধ্যাপক হবে।"

রাডিচাচা তাঁর দিলখোলা হাসি হেসে উঠলেন। অধ্যাপক হবে। কি মজার কাণ্ড! শুধু ভাল ছাত্ররাই অধ্যাপক হবার আশা করতে পারে। কিন্তু তাই বলে মা হয়ে পলিন যদি তাঁর ছেলের মন্থরভাব ঢাকতে চেষ্টা করেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। পরিবারের সবাই মিলেমিশে থাকবে, একে অপরকে রক্ষা করবে এই তো নিয়ম। ছোট অ্যালব্যার্টকে সবাই তারা ভালবাসে, যদিও সময় সময় ভাবে, ছেলেটা অপর ছেলেদের মত কিছুতেই হতে পারবে না।

কোন খেলনা হাতে দিয়ে এই শান্ত ছেলেটাকে কেউ খুশী করতে পারত না। মায়া যখন তার পুতুল নিয়ে খেলা করত অথবা অন্য কোন খেলনা নিয়ে থাকত, তার ভাই তখন নিঃশব্দে সরে গিয়ে বাগানের এক কোণে লতার ঝোপের ভেতর উপুড় হয়ে সুন্দর কোন লতাপাতা নাড়াচাড়া করত অথবা পিঁপড়েরা যে ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই চেয়ে চেয়ে দেখত।

আইনস্টাইনের অসুখবিসুখ হলে তাঁর মা-বাবা স্বভাবতই খুব চিন্তিত হয়ে পড়তেন। ওষুধ দিয়ে তাঁর জ্বর বা সর্দি তাঁরা সারাতেন কিন্তু তাঁর চোখের শ্রান্ত দৃষ্টি কিছুতেই সারাতে পারতেন না। বিছানায় শুয়ে তিনি তাঁর শ্রান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন। কোন নালিশ তিনি করতেন না, আপন মনে বালিশে মাথা রেখে বাগানের দিকে চেয়ে থাকতেন বড় জানালাটা দিয়ে। মা বাবা আইনস্টাইনকে আনন্দ দেবার জন্যে সব কিছু করতেন।

একবার আইস্টাইনের সর্দি হয়েছিল। তাঁর সর্দি যখন প্রায় সেরে উঠেছে এমন সময় কি একটা কাজে তাঁর বাবা গেলেন শহরে। সেখানে এক দোকানে ছোট্ট একটা কম্পাস্ দেখতে পেয়ে তিনি ভাবলেন, এই জিনিসটা হাতে পেলে হয়ত তাঁর ছেলে খুশী হয়ে উঠবে, কিছু সময়ের জন্যে তাঁর মনোযোগটা এদিকে দেবে।

তিনি কম্পাস্‌টা বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এনে বললেন, "এই দেখো কি মজার জিনিস এনেছি তোমার জন্যে। চেয়ে দেখো, আজব এক কৌটোর ভেতর যাদুর সুচ। যেদিকে খুশী তুমি কৌটোটা ঘুরাও-ফেরাও না কেনো সুচের মাথাটা একদিকেই থাকবে।"

আইনস্টাইন কৌটোটা তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। তারপর এদিক ওদিক ঘোরতে লাগলেন কিন্তু সুচ আস্তে সরে গিয়ে ঠিক আগের মত একই দিকে মাথা রেখে দাঁড়ায়। খেলনা ছেলের মনের মত হয়েছে দেখে তাঁর বাবা খুব খুশী হলেন।

আইনস্টাইন জিজ্ঞেস করলেন, "সুচটা সব সময় ঘুরে একই দিকে কি করে থাকে, বাবা ?"

"ব্যাপারটা এখনই ঠিক তুমি বুঝতে পারবে না। পৃথিবীর আকর্ষণ বা চুম্বকশক্তি ওটাকে এভাবে ঘুরিয়ে রাখে।"

"কি বললে কথাটা ?"

যে ছেলের পক্ষে কথা বলাই কষ্টকর সে নতুন একটা শব্দ কি করে মনে রাখবে ? তার বাবা বললেন, "ওটার নামে কিছুই আসে যায় না। মনে করো ওটা একটা অদৃশ্য শক্তি এবং ওর নামটাও অদ্ভুত। খেলনা দিয়ে খেলবে, আমোদ করবে।"

"কিন্তু বাবা, সুচটা ওরকম করছে কেনো ?"

তাঁর বাবা মিঃ আইনস্টাইন তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন। অর্ধেক পথ যেতে যেতে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "তোমার চাচা জেককে জিজ্ঞেস ক'রো, তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবে।"

জেক মিঃ আইনস্টাইনের এক ভাই। এক সঙ্গে তাঁরা ব্যবসা করেন। তাঁদের ছোট্ট একটি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকান আছে। অ্যালবার্টের বাবা হেরমান আইনস্টাইনের উপর কারবারের ভার। আর তাঁর ভাই জ্যাকব আইনস্টাইন একজন পাস করা ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর উপর ভার কাজকর্মের। অ্যালবার্টের মনে যত রকমের প্রশ্ন জাগে ধৈর্যসহকারে তা তাঁকে বুঝিয়ে দেন একমাত্র তাঁর এই চাচা জেক্‌।

অ্যালবার্ট শুয়ে আছেন কিন্তু কম্পাসটি তাঁর হাতেই আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা এভাবে কাটছে। ধীরে অতি ধীরে, তিনি এটি ঘোরান, আস্তে চাপড় মারেন, বাঁকা করে ধরেন, একেবারে উল্টিয়ে ফেলেন—যা'

খুশী করেন কিন্তু সূঁচটা ঠিক আগের মত উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

অ্যালবার্টের মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। তাঁর মনে উত্তেজনার ভাব। প্রথমে তিনি বুঝতে পারলেন, প্রকৃতিতে এমন অনেক জিনিস আছে যা দেখা বা ধরা ছোঁয়া যায় না—অনেক সময় কল্পনাও করা যায় না। ঐ সূচটাকেও বাইরের কোন শক্তি এমনি করে নাড়ছে। কিন্তু বাইরের জগৎ যে শূন্য! তাঁর চাচা জেকই তো তা বলেছেন। তা হলে বুঝতে হবে বাইরে যদি সত্যি কোন শক্তি থাকে যা সূচটাকে নাড়ছে, তবে তা শূন্য হতে পারে না।

তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে ভাবলেন। তাঁর মা এসে তাই দেখে তো তাজ্জব। ছেলের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গাল মুখ লাল হয়ে উঠেছে। খেলনাটা রেখে দিয়ে তিনি অ্যালবার্টকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলেন। অ্যালবার্টের কিন্তু বহুক্ষণ অবধি ঘুম পেল না। কম্পাসটা তাঁর প্রিয়বস্তু হয়ে উঠল। বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম পরিচয়।

ছোট্ট আইনস্টাইন স্কুলের পড়াশুনায় যাতে ভাল করতে পারে সেজন্য তাঁর চাচা জেক্ তাঁকে যত্ন সহকারে সাহায্য করেন, বাড়ীর অন্যান্য সবাইও কম করেন না কিন্তু ফল কিছুই হয় না। কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে অনেকক্ষণ না ভেবে অ্যালবার্ট তার জবাব দিতে পারেন না। এর ভেতর অনেকেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার মত হয়েছে ওদিকে ক্লাসের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

অ্যালবার্টের বয়স যখন ন বছর তখন তিনি প্রাইমারীস্কুলের সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীতে উঠেছেন। তখন কোন প্রশ্নের জবাবে পুরোপুরি শুদ্ধ ছাড়া একটি কথাও তিনি বলতেন না। এমনকি তাঁকে মারধর করলেও তিনি কখনো মিথ্যা কথা বা ভুল জবাব দিতেন না। এজন্য তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা তামাসা করে তাঁর ডাক নাম দিয়েছিল 'সৎ জন।' তাদের কিছু প্রশ্ন করলে যা খুশী একটা জবাব দিয়ে তারা রেহাই পাবার চেষ্টা করত।

দশ বছর বয়সে অ্যালবার্ট ভর্তি হলেন লুট্পোল্ড জিমনাসিয়ামে। জার্মানীতে জিমনাসিয়াম বলা হয় এক শ্রেণীর স্কুলকে। ব্যবহারিক কিছু একটা শিখতে হ'লে এসব স্কুলের ডিপ্লোমা নিয়ে ঢুকতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অ্যালবার্টকে লুট্‌পোল্ডে ভর্তি করে পরিবারের লোকেরা সংশয়ের মধ্যেই রইলেন। তাঁদের ভাবনা, অ্যালবার্ট প্রাথমিক স্কুলেও সবার নীচে পড়ে রয়েছেন, কোনকিছুই সহজে বুঝতে পারেন নি।

এই হ'ল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বাল্যজীবন, যিনি পরবর্তী জীবনে খ্যাতি লাভ করেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্‌ হিসেবে।

দুই

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পরে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনে পরিণত হন। তিনি কোথাও গেলে খবরের কাগজের লোকেরা তাঁর সঙ্গ নিতেন। এভাবে সারা দুনিয়ার লোকের কাছে তাঁর চেহারাটা পরিচিত হয়ে উঠল। তখন তিনি রাজরাজড়ার গৃহে হতেন সম্মানিত অতিথি। তিনি যখন শহরের কোন রাস্তা দিয়ে চলতেন তখন তাঁকে একনজর দেখবার জন্য লোকের হুড়োহুড়ি লেগে যেত। এজন্য শেষের দিকে কয়েক বছর তাঁকে চল্‌তে হয়েছে শরীর রক্ষক সঙ্গে নিয়ে। তা না হলে অতি কৌতূহলী লোকেদের কেউ হয়ত স্মরণ-চিহ্ন হিসেবে রাখবার জন্য তাঁর কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করত, কেউ হয়ত তাঁর গলাবন্ধটা নিয়েই টানাটানি করত।

একদিন এক রেলওয়ে স্টেশনে অনেক লোক এসে জড়ো হল আইনস্টাইনকে দেখতে। জনতার সামনের দিকে একটি লোক একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে। মাথায় সাদা বাবরি চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে। আনন্দধ্বনি সহকারে তাঁকে সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ছেলেটি এবং তার বাবাও আনন্দধ্বনি করে উঠল। পরে ছেলেটির দিকে ফিরে তার বাবা বলল, "আজকের একথা কোনোদিনও ভুলো না, বাবা। এইমাত্র যাঁকে তুমি দেখলে তিনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষদের একজন।"

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সম্বন্ধে তখনই এই ছিল লোকের ধারণা। তবু এটা আশ্চর্যের বিষয়, যে সামান্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ধারণা বা মতের জন্য আইনস্টাইনের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল দুনিয়ার খুব কম সংখ্যক লোকেরই। এজন্যই মানুষের আগ্রহ আরও বেড়ে যেত। তাঁর কাজ ছিল পদার্থবিদ্যা নিয়ে। পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। 'বস্তু' কি এবং কি ভাবে তা কাজ করে তাই নিয়ে পদার্থবিদ্যার কাজ কারবার।

পৃথিবীতে যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি—তামা, পিতল, লোহা, মানুষ, পানি, বাতাস—এমন কি চাঁদ, সূর্য, তারা সবই বস্তুর সাহায্যে তৈরী। এসব জিনিস সম্বন্ধেই আইনস্টাইন এমন কতকগুলো নতুন কথা বলেন যা শুনে অপরাপর বিজ্ঞানীরা তাঁকে খুব বড় রকমের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে স্বীকার করেন। তাঁর এই অসাধারণ চিন্তার জন্যই তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই বিপুল সম্মান ও সমাদর পেয়েছেন। এই শান্ত ও মিতাচারী বিজ্ঞানী সারা দুনিয়ার অন্তর জয় করেন।

ভবিষ্যতে কি ঘটবে মানুষ তা জানে না। আপনভোলা ছেলে আইনস্টাইনও যে কালে কিছু একটা হবেন তা কেউ বুঝতে পারে নি। লুটপোল্ডে জিমনাসিয়ামে তাঁর সেই শান্ত স্বপ্নালু ভাব দেখে সবাই তাঁকে বোকা মনে করতেন। বাড়ীতেও একা থাকতে পছন্দ করতেন বলে সবাই তাঁকে অসামাজিক বলতেন।

স্কুলে যাওয়া অ্যালবার্টের জন্য দিন দিন কঠিন হয়ে উঠল। তাঁকে ল্যাটিন ও গ্রীক শিখতে হ'ত কিন্তু বিদেশী ভাষা তাঁর মুখে আসত না, ব্যাকরণ শিখবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কোন জিনিস শেখানোর জন্য ছেলেদের তা বার বার অভ্যাস করানো, একই জিনিস বার বার লিখে মনে রাখবার চেষ্টা—এসবকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এসব শিখতে তাঁকে যত বেশী চাপ দেওয়া হত মন তাঁর তত বেশী বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

ইতিহাসেও তিনি বিশেষ ভাল ছিলেন না। ইতিহাসের এত সব তারিখ তাঁকে কেন মনে রাখতে হবে তিনি ভেবে পেতেন না। তারিখগুলি সব বইতেই লেখা রয়েছে। দরকার মত বই দেখেই সে তারিখ বের করতে পারবেন। তবে আবার মুখস্থ করবার দরকার কোথায়?

তাঁর পাঠ্য সমস্ত বিষয়েই নানারকম প্রশ্ন করে তাঁর শিক্ষককে বিরক্ত করতেন। শুধু বলতেন, "ওরকম কেন হয় ?" "এটা কি করে হলো ?" ইত্যাদি। শিক্ষক তখন তাঁর দিকে চেয়ে চমৎকার করে বলে উঠতেন, "কেবল কেন কেন কর না, কথার জবাব দাও।"

খুঁটিনাটি জানবার আগ্রহে অ্যালবার্ট যে সব প্রশ্ন করতেন শিক্ষক তার জবাব দিতে গিয়ে বিরক্তি বোধ করতেন। তাঁর অনেক প্রশ্নের কোন জবাবই হ'ত না। জবাব হলেও শিক্ষকরা তা জানতেন না।

অ্যালবার্টের চাচা জেকব কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে খুব সাহায্য করতেন। অ্যালবার্ট একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাল্‌জাব্রা কা'কে বলে ?"

জেকব বুঝিয়ে দিলেন, "অ্যাল্‌জাব্রা এক মজার বিজ্ঞান। মনে করো আমরা এমন একটা ছোট জানোয়ার শিকার করতে বেরিয়েছি যার নাম আমাদের জানা নেই। কাজেই আমরা তার নাম দিলাম 'এক্স'। যখন শিকারটাকে আমরা ধরে ফেললাম তখন তার ঠিক ঠিক নামটা রাখলাম।"

এর ফলে অ্যাল্‌জাব্রা বিষয়টা তাঁর কাছে সত্যিই খুব মজার বলে মনে হল এবং অন্য ছেলেরা যখন যোগ অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামায় তখন তিনি অ্যাল্‌জাব্রা শিখে ফেলেছেন।

এরপর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পড়তে শিখলেন। কয়েকটা অক্ষর একত্র করে শব্দ তৈরি করার কাজটা প্রাইমারী স্কুলে খুবই কঠিন মনে হত। এখন জিমনাসিয়ামে এসে আর তা' মনে হয় না। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, শব্দের পর শব্দ এমন চমৎকার মিলে যায় যে একটা বিশেষ অর্থও হয়। এই শব্দ মিলেই তো গ্যেটে আর মিলারের কবিতা তৈরি হয়েছে। তিনি যা কিছু জানতে চান, শব্দ একত্র হয়েই তা তাঁকে জানিয়ে দেয়। শিক্ষককে না-রাগিয়েও এখন তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব বের করতে পারেন।

এক একটা বছর শেষ হয় অ্যালবার্ট আরো বেশী করে পড়েন। তিনি একবার সন্ধান পেলেন কতকগুলি বিজ্ঞানের বইয়ের। সেই বইগুলি ছিল জীবজন্তু, গাছপালা, মেঘ, গ্রহ-নক্ষত্র, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি বিষয়ে। অ্যালবার্ট সবগুলি বই প'ড়ে শেষ করে ফেললেন। একবার কোন এক উপরের ক্লাসে তিনি পেলেন একখানা রেখাগণিতের পাঠ্যবই।

দু' সপ্তাহ সময়ের ভেতর তিনি রেখাগণিত শিখে ফেললেন এবং বই-এর সবগুলো 'প্রবলেম' শুদ্ধভাবে করে ফেললেন। এই বইখানা পড়ে যে আনন্দ ও উত্তেজনা তিনি পেয়েছিলেন জীবনে তা কখনো ভুলতে পারেন নি।

গান বাজনায়ও তিনি খুব আনন্দ পেতেন। ছেলেবেলায় বরাবরই তিনি বেক, বিটোভেন ও মোজার্টের গান বাজনা শুনেছেন। তাঁর মাও গানবাজনা ভালবাসতেন। সপ্তাহে একবার করে তাঁদের বাড়ীতে শৌখীন গাইয়ে বাজিয়েদের আসর বসত। খাবার টেবিলের তলায় বা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে অ্যালবার্ট তা শুনতে চেষ্টা করতেন। তারপর কেউ তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ফেললে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন।

অ্যালবার্ট যখন ছয় বছর বয়সে পড়লেন, তখন তাঁর মা তাঁকে কিনে দিলেন একটা বেহালা। বেহালা কিনে দিয়ে গান-বাজনা শিখবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের মত সেখানেও তাঁর ভাল লাগত না। বেহালা নিয়ে এত সময় ধরে বাজনা অভ্যাস করার ধৈর্য তাঁর ছিল না। তাঁর কাছে এ বাজনা মোটেই বাজনা বলে মনে হত না। তাঁর মনে হত, সত্যিকার বাজনা বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা হল মোজার্ট আর বেকের বাজনা।

জিমনাসিয়ামে অ্যালবার্টের দিনগুলি কেটে গেল যেন হোঁচট খেয়ে চলার মত। তাঁর শিক্ষক বা সহপাঠীদের কারো মনের উপরই তিনি কোন দাগ কাটতে পারলেন না। তাঁর ভেতরে যে ভবিষ্যতের বড় বিজ্ঞানী গড়ে উঠছে কেউ সে সন্ধান তখন পায় নি।

জিমনাসিয়ামে ক্লাসিক সাহিত্য পড়াতেন প্রোফেসর রুস্। তাঁর ক্লাসে পড়তে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের খুব ভাল লাগত। এই প্রোফেসরটির কথা অ্যালবার্ট বরাবর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, কারণ তিনিই পুথিপুস্তকের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন। কয়েক বছর পরে, অ্যালবার্টের নাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, তখন একদিন তিনি মিউনিকের পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর মনে হল প্রোফেসর রুসের কথা। একবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবেন বলে অ্যালবার্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। প্রোফেসর দরজা খুলে এক যুবককে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

তখন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বললেন, "আমি এক সময়ে আপনার ছাত্র ছিলাম। আমাকে চিনতে পারেন কি?"

প্রোফেসর তাঁকে আদৌ চিনতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অ্যালবার্ট তখন মিটিমিটি হাসছিলেন। প্রোফেসর ভাবলেন হয়ত টাকা ধার চাইতে লোকটা এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ করে ফেললেন। আইনস্টাইন মন ভারী করে ফিরে এলেন।

জিমনাসিয়ামে যখন অ্যালবার্টের শেষ বছর চলছে তখন তাঁদের পরিবারে এক বিপর্যয় ঘট্‌ল। তাঁদের ব্যবসায়ে লোকসান ঘটল। পরিবারের সবাই মুষড়ে পড়লেন। এরপর কি করা যাবে এই নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। ঠিক হল, বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে সবাই তাঁরা চলে যাবেন ইতালীতে মিলান শহরে। সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে হয়ত কিছু একটা ব্যবসা গড়ে তোলা সহজ হবে।

অ্যালবার্টের মা কিন্তু মহাভাবনায় পড়লেন। তিনি বলে উঠলেন, "তা'হলে অ্যালবার্টকে নিয়ে কি উপায় করব? ওর বয়স মোটে পনর, একটা ডিপ্লোমা না-পাওয়া অবধি ওকে তো জিমনাসিয়ামে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে।"

অ্যালবার্টের বাবা মেঝের উপর পায়চারী করতে করতে বললেন, "তাইত, ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায়? মায়া এখনও ছোট। ওর জন্য তেমন ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু অ্যালবার্ট---।"

তিনি উদ্বিগ্নভাবে স্ত্রীর দিকে চাইলেন। তাঁরা উভয়েই জানতেন, ছেলে ছাত্র হিসেবে খুব ভাল নয়। এ অবস্থায় স্কুল পরিবর্তন করলে যে ক্ষতি হবে তার পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

মা অ্যালবার্টকে খুব ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে। কিন্তু তবু কি করলে ছেলের ভাল হবে তিনি তা চিন্তা করতেন। তিনি তাই দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, "আমরা অ্যালবার্টকে এখানেই রেখে যাব। পড়াশুনা শেষ করে সে যেতে পারবে আমাদের কাছে মিলানে।"

অবশেষে সে রকম ব্যবস্থাই হল। অ্যালবার্ট মিউনিকের এক বোর্ডিং হাউসে থেকে জিমনাসিয়ামে পড়াশুনা করতে লাগলেন।

কোন রকমে চোখমুখ বুজে তিনি কয়েক মাস কাটিয়ে দিলেন। স্কুল তাঁর কাছে আরও খারাপ মনে হতে লাগল। স্কুল থেকে বাড়ী

ফিরে গিয়ে একটু আরাম করবেন সে উপায়ও এখন নেই। শিক্ষকদের নিয়ে এখন তাঁর অসুবিধা আরও বেড়ে গেছে। একদিন একজন শিক্ষক তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, "আইনস্টাইন, আমার ক্লাসে তোমার ঐ প্রশ্ন করার অভ্যাসটা ত্যাগ করে চলতে হবে। তোমার ও-সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ফলে আমার উপর অন্যান্য ছাত্রদের যে শ্রদ্ধা ছিল তা কমে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভাল হত যদি তুমি এ স্কুল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে।"

অ্যালবার্টের পক্ষে এটা একটা চরম আঘাত। এর পর অ্যালবার্ট আর ওখানে থাকতে পারেন না। তিনি ডাক্তারকে অনুরোধ ক'রে একটা চিঠি আনলেন। ডাক্তার লিখে দিলেন, অ্যালবার্টের শরীর ভাল যাচ্ছে না। কিছু দিনের জন্য তাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। এর ফলে স্কুল থেকে ছুটি পেতে আর কোনই অসুবিধা রইল না। অ্যালবার্ট আর সময় নষ্ট না করে মিলানের ট্রেনে গিয়ে উঠলেন।

তিন

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইতালী। তার মনোরম নীল আকাশই বা কত উজ্জ্বল। সব কিছুর উপর সূর্যের আলো পড়েছে যেন গলিত সোনা। ইতালীতে প্রথম পা দিয়েই তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনের কোণে অতীতে যে ব্যথা-বেদনা জমে উঠেছিল তাও সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেতে লাগল।

পরিবারের সবাই তাঁকে অতি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। মা তো প্রথমেই আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন চেয়ে। কিন্তু যা দেখলেন তাতে মন তাঁর খুশী হল না। ছেলেটা অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখও তাঁর মলিন। তাঁর চোখের সেই উৎসুক দৃষ্টিও যেন আর নেই। চোখের দৃষ্টিতে যেন বিষাদের ছায়া।

ছোট্ট একটি নিশ্বাস ছেড়ে মা বলে উঠলেন, "তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্, মিন্ অ্যালবার্টল ?" মিন অ্যালবার্টল অর্থাৎ প্রিয় ছোট অ্যালবার্ট। এ নামেই তাঁর মা বরাবর তাঁকে ডাকতেন। তিনি যখন তাঁকে ডাকতেন তখন শোনাত যেন 'আল্‌বিট্‌ল'। মা আবার বললেন, 'যাক্‌গে' বাড়ীতে যখন এসে গেছিস্ তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে। আজকে রাত্তিরে খাবার জন্যে আমাদের কি রান্না হচ্ছে অনুমান করতে পারিস ?"

দুষ্ট ছেলের মত অ্যালবার্টের চোখ মিট্‌মিট্ করে উঠল। তিনি বললেন, "পাখীর ডিম !"

"এই তোমার বুদ্ধি ! না, তা হচ্ছে না। আজকে হবে ঘন মসুরের ডাল আর তোর প্রিয় খাদ্য কাবাব।"

ঘর গেরস্থালীর কাজে অ্যালবার্টের মা খুব পাকাপোক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন, পুষ্টিকর ভাল খাবার পেলেই অ্যালবার্টের শরীর ভাল হয়ে যাবে।

অ্যালবার্ট মায়ের কথা শুনে হাসতে লাগলেন। সবার সঙ্গে বাড়ীতে থাকা সত্যিই বড় আরামের। অন্য কেউ হলে হয়ত এই নতুন বাড়ীটার কোথায় কি আছে তন্ন তন্ন করে দেখতে আরম্ভ করত অথবা গেলো ছ'টা মাসে কী কষ্টে যে কেটেছে তার বিবরণ দিতে শুরু করত। কিন্তু অ্যালবার্টের প্রকৃতি তা' নয়। বাড়ীতে আপন-জনদের আদর যত্নে জার্মানীর সেই জিমনাসিয়ামের কঠিন দিনগুলির স্মৃতি ধীরে ধীরে মলিন হতে লাগল।

আইনস্টাইন পরিবারের লোকেরা ছিলেন সরল প্রকৃতির কষ্ট-সহিষ্ণু লোক। বন্ধুবান্ধবদের হৈ চৈ গোলমালের ভেতরও যে ছেলে চুপচাপ একলা থাকতে চায়, সেই অ্যালবার্টকে নিয়ে কি করানো যাবে তাই তাঁদের রাতদিনের ভাবনা। ছেলেটা প্রায় কথাই বলত না, কৃচিৎ সে তার মনের কথা অপরকে খুলে বলত। কিন্তু স্নেহশীল মা-বাবা তাঁর মুখ দেখেই মনের কথা বুঝে ফেলতেন।

বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "মিউনিকে এক'মাস ওর খুব খারাপ ভাবে কেটেছে বলে মনে হয়।"

"ছেলেটা খেটে খেটে এ রকম হয়েছে। খাটুনি ওর পক্ষে খুব বেশী হয়েছে। দেখা যাক, কি হয়। আমার তো মনে হয়, ভাল

খেয়ে দেয়ে এখানকার আবহাওয়ায় ছেলের শরীর শুধরে যাবে।" অ্যালবার্টের মা বললেন।

বাবা ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, "হাঁ, কথাটা খুবই ভাল। কিন্তু পলিন, তুমি জান, ব্যবসায়ের অবস্থা মোটেই ভাল না। সেয়ানা ছেলেকে আরামে রেখে পুষবার মত টাকা-পয়সা আমাদের নেই। অবশ্যি আমি বলছি না যে, এক্ষুণি সে রোজগারের পথ দেখবে কিন্তু তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করা উচিত। কি সে করবে? কি ধরনের কাজের উপযোগী সে হয়েছে? কোন কাজের উপযোগী সে হয়েছে বলে তো মনে হয় না। ইলেকট্রিকের দোকানের কাজেও তার কোন আগ্রহ নেই। আসল কথা, বই পড়া আর স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই তার কোন আগ্রহ নেই।"

অ্যালবার্টের মা যেন ভয়ে ভয়েই বললেন, "অঙ্কে কিন্তু ওর মাথা বেশ চমৎকার খেলে। অঙ্ক দিয়ে কোন কাজ হতে পারে না কি?"

"হ্যাঁ, অঙ্ক আর রেখা গণিতে সে অবশ্য খুবই পটু। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে বা শিল্প বিষয়ে কিছু একটা করতে হলে অঙ্কের বাহাদুরী ছাড়াও কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ সম্বন্ধে আমরা খোলাখুলিভাবেই ওর সঙ্গে কথা বলব। দেখা যাক, তা করেও যদি বাস্তব কিছু একটা কাজের দিকে ওর মন ফেরাতে পারি।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।" মিসেস আইনস্টাইন স্বামীর কথায় সায় দিলেন। তাঁর চোখের পাতা একটু ভারী হয়ে এল। তিনি বলতে লাগলেন, "ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। কিন্তু এখন কিছুদিন তাকে অবসর ভোগ করতে দেওয়া যায় না কি? এসো, কিছু সময়ের জন্যে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা আমরা করে দিই। এতদিন মনমরা হয়ে কাটিয়েছে তো।"

কাজেই, ঠিক হল স্কুল আর পড়াশুনার কথা কিছুদিনের জন্য অ্যালবার্ট ভুলেই যাবে। তাঁর মা-বাবা ভাবলেন, কিছুদিন ছুটি পেলে শরীরটা ওর ভাল হবে। তখন পুরো উদ্যমে পড়াশুনা শুরু করতে পারবে।

কিছুদিন নিশ্চিন্তে একা ঘুরে বেড়ানোর এ ব্যবস্থায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মনও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। নতুন নতুন চিন্তা তখন তাঁর মনে। একটা ব্যাপারে তিনি স্থির নিশ্চিত যে, তাঁকে আর

জার্মানীতে ফিরে যেতে হবে না। গেলেও সেখানকার স্কুলে যেতে হবে না। আর কখনো তাঁকে শিক্ষকদের জ্বালাময় দৃষ্টির সামনে বসে ইতিহাসের তারিখ আর ল্যাটিন ভাষার ক্রিয়ারূপ মুখস্থ করতে হবে না। ভবিষ্যতে তিনি কি করবেন তা বুঝতে না পারলেও তিনি স্থির করলেন বর্তমানের এই ভাবনাহীন দিনগুলিকে কিছুতেই বৃথা ব্যয় করবেন না।

তাঁর কাছে সবচেয়ে সুখের বিষয় ছিল পড়ার ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা। এতদিন যে সব বই পড়ার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন এখন তা পড়বার সময় সুযোগ পাওয়া গেল। সারাক্ষণ তিনি বই পড়েই কাটাতে লাগলেন। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই দেখা যেত একখানা বই তাঁর বগলদাবা করাই আছে।

ইতালীতে এসে মায়ার অনেক বান্ধবী জুটেছিল। মায়ার গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির এই ভাইটিকে তার বান্ধবীরা সবাই খুব পছন্দ করত। তারা তাঁকে ডাকত 'অ্যালবার্টো' বলে এবং কোথাও বেড়াতে গেলে তাঁকে ডেকে নিয়ে যেত। তিনি কখনো নিজে সেধে হৈ-হল্লোড়ের ভেতর যেতেন না কিন্তু ছোটখাটো তামাশার কথা বেশ বলতে পারতেন। অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যেত না। পরে হয়ত দেখা যেত, একটা গাছের ছায়ায় অথবা উঁচু টিলার আড়ালে বসে তিনি বই পড়ছেন।

হেঁটে হেঁটে বেড়ানো ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক। হাঁটার মানেই হল প্রকৃতির কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া। তাঁর সজাগ মন সব সময়েই প্রকৃতির সবকিছু লক্ষ্য করত। ছোট্ট একটা ফুলের কুঁড়ি, ঝরণার জলধারা, একটা টিলার আকৃতি, সূর্যাস্তের মনোরম আলো—সবই তাঁর মনকে আকর্ষণ করত। বাতাস যখন জোরে বইত আর হ্রদের বুকে ঢেউ ওঠানামা করত তখন তিনি কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকতেন। চাঁদ আর তারাগুলির দিকে তিনি চেয়ে থাকতেন আর ভাবতেন, এদের ওপিঠে কি আছে সেই ভাবনা।

মানুষের তৈরি আজব জিনিসও তাঁকে কম বিস্মিত করত না। মিলানের প্রশস্ত গীর্জায় বিশ হাজার লোক এক সঙ্গে উপাসনায় যোগ-দান করতে পারে। অ্যালবার্ট ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন সেই গীর্জার ভেতরকার শান্ত পরিবেশে। শক্ত পাথর কেটে এমন সুন্দর

জিনিস কি করে মানুষ তৈরি করতে পারে, তিনি অবাক হয়ে তাই ভাবতেন।

মিলানের সান্টা মেরিয়া গীর্জার দেয়ালে আঁকা শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্র 'দি লাস্ট সাপার' তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন।

একদিন তাই তিনি মাকে বললেন, "ছবিটা এখনও বেশ সুন্দর আছে কিন্তু দ্য ভিঞ্চির দেওয়া রং জ্বলে গেছে।"

মা বললেন, "এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? তিনি 'দি লাস্ট সাপার' এঁকেছেন চার শ' বছর আগে। আমার মনে হয় চারশ' বছরে একটা জিনিস এতটুকু মলিন হতে পারে।"

অ্যালবার্ট তখন মাথা নেড়ে বললেন, "এর চেয়েও পুরানো অনেক চিত্র আছে কিন্তু সেগুলো মোটেই মলিন হয়নি। দ্য ভিঞ্চি এঁকেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে; আগে কখনো ব্যবহার করেননি এমনি রং তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, কাজেই যা জানা হয়ে গেছে তার বাইরের জগৎ জানবার জন্য ছিল তাঁর আগ্রহ।"

মা তাঁর নিজের ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "মানুষের উচিত বরাবর যা হয়ে এসেছে তাতেই খুশী থাকা। বিজ্ঞানী যা' আছে তাকে অবহেলা করে নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি যদি বুদ্ধিমান হতেন তাহলে তাঁর এই ছবি যেমন এঁকেছিলেন আজও তেমনি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকেই থাকত।"

এদিকে অ্যালবার্ট কিন্তু মার কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। তাঁর চোখে তখন মায়ের চিরপরিচিত স্বাপ্নিকের দৃষ্টি। মা তাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ছেলের ডাক শুনে তাঁকে ফিরে দাঁড়াতে হল।

অ্যালবার্ট বলে উঠলেন, "মা, আমার ইচ্ছে হয় একটু ঘুরে ফিরে এ দেশটা ভাল করে দেখতে। কত সুন্দর আর আনন্দের জিনিসই এ দেশে আছে।"

"দেশভ্রমণ! হ্যাঁ, তা, সত্যি। কিন্তু আমাদের তো তেমন টাকা-পয়সা নেই, মিন্ আলবিটল। তুমি তো জানই, তোমার বাবার ব্যবসায়ের অবস্থা তেমন সুবিধার নয়, তা ছাড়া...।"

তাঁকে থামিয়ে অ্যালবার্ট বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, তা, আমি জানি মা। কিন্তু টাকা-পয়সা আমি কিছুই চাইছি না। আমি একাই

হেঁটে হেঁটে বেড়াব, রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় ক্যাম্প তৈরি করে ঘুমাব।"

তার পরের দিনই তিনি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়ে গেলেন। লামবারডি সমতল ভূমি পার হয়ে প্রথমে জেনোয়া, তারপর সেখান থেকে ইতালীর মনোরম উপকূল ছাড়িয়ে পিসায়। দেশের অভ্যন্তর ভাগে না গিয়ে তিনি পাহাড় অঞ্চলে প্রাচীন সব গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ফ্লোরেন্সের শিল্পসম্ভার দেখে তিনি অশেষ আনন্দ উপভোগ করলেন। চারদিক ঘেরাও করা পাহাড়ের উপর থেকে এই সুন্দর শহরটির দিকে চেয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনে ভাবনাহীন এই দিনগুলি ছিল সত্যিই সুখের। মিলানে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীর ও মন অনেকখানি ভাল হয়েছে।

কিন্তু বাড়ীতে এসে তাঁকে শুন্‌তে হল একটা দুঃসংবাদ। তাঁর বাবার ব্যবসায় আবার ফেল পড়েছে এবং পরিবারের সবাই প্যাভিয়া চলে যাবার আয়োজন করছেন।

চার

আইনস্টাইন-পরিবার একেবারে মুষড়ে পড়লেন। প্যাভিয়ায় গিয়ে নতুন করে একটি ব্যবসায় গড়ে তুলতে হবে, বসবাসের জন্য বাড়ী করতে হবে। সেখানে পনর ষোল বছরের একজন কিশোরের করবার কিছুই নেই। ব্যবসায়ে কি সাহায্য সে করতে পারে?

সবচেয়ে ভাবনার ব্যাপার হল, অ্যালবার্টের লেখাপড়ার খরচ চালাবার সঙ্গতিও আর তাঁদের নেই। অ্যালবার্টের মা-বাবা এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, এমন একটা কিছু করতে বলেন যাতে অদূর ভবিষ্যতে কিছু আয় হতে পারে। তাঁরা বললেন, "তুমি এক মনে কিছু একটা কাজের চিন্তা কর।"

অবশ্য অ্যালবার্টের মনেও যে সে সব চিন্তা ছিল না, তা' নয়। ইতালীর মনোরম পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য যখন তিনি উপভোগ করেছেন, যখন মিউজিয়ামে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন, হ্রদের ঝলমলে ঢেউ বা নীল আকাশের দিকে চেয়ে যখন তাঁর দিন কেটেছে—তখনও তিনি এসব চিন্তাই করেছেন। ভবিষ্যতে কি তিনি করবেন তার চেয়ে কি কি করবেন না সে চিন্তাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত বেশি। লেখাপড়া শেখানোর জন্য যেখানে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে তিনি কখ্খনো আর যাবেন না। সে জন্য স্কুলের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্ক ত্যাগ করতেও তিনি রাজী। তিনি ঠিক করেছিলেন, কোন কিছুর পেছনে তিনি কখনো 'ধাওয়া' করবেন না। ধাওয়া করা বলতে তিনি বুঝতেন টাকা-পয়সা, খ্যাতি, যশ, আরাম-আয়েস লাভের পেছনে মানুষের অবিরাম চেষ্টাকে। এসবের উপর তাঁর কোন আসক্তিই ছিল না।

ভবিষ্যতে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব বলে যে সব কাজের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তার ভেতর শিক্ষকতা একটা। তিনি ভাবলেন, এতদিন নিজে যে ভাবে শিক্ষা পেতে চেয়েছেন ঠিক সে ভাবে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন। শিক্ষাদানের কাজে চাই ধৈর্য এবং চিন্তা-শীলতা—জোর জবরদস্তির স্থান সেখানে নেই। তিনি ভাবতেন, সে ধরনের কাজ করেই তিনি আনন্দ পাবেন। কিন্তু তা, করতে হলে শিক্ষাগত সার্টিফিকেট দরকার। সে যোগ্যতা তাঁর নেই। মোটকথা, অতি সাধারণ কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাই তাঁর নেই। শিক্ষকতার কাজটাই তাঁর পছন্দ, অবশ্যি যদি বিজ্ঞান বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে থাকে।

অ্যালবার্টের মা-বাবা ছেলেকে ভালভাবেই জানতেন। তারা তাঁকে ভালবাসতেন, তাই বলে তিনি তাঁর দোষত্রুটির কথা ভুলে থাকতেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন, অ্যালবার্ট ধরাবাঁধা কাজ কোনদিনই করতে পারবে না। তাঁদের বিবেচনায়, অ্যালবার্ট স্বপ্নবিলাসী, অবাস্তব, নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, ভবিষ্যতে বড় হবার কোন উচ্চাশাও পোষণ করে না।

অবশেষে ঠিক হল, অ্যালবার্টকে শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু একটা শিখাতে হবে। অ্যালবার্ট ভাল অঙ্ক জানতেন, তা' ছাড়া তাঁর বাবা ছিলেন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার—এ জন্যই অ্যালবার্টের জন্য এ ব্যবস্থা

সঙ্গত মনে হল। তিনি জিমনিসিয়ামের কোন ডিপ্লোমা পাননি সত্য কিন্তু তাঁর মা-বাবা আশা করেছিলেন, অঙ্কের জোরেই অ্যালবার্ট কোন একটা টেকনিক্যাল কলেজে ঢুক্‌তে পারবেন। অ্যালবার্টের জেদ এ কলেজটা হ'তে হবে জার্মান ছাড়া অন্য কোন জায়গায়। বাড়ীর সবাই ঠিক করলেন, জুরিখের সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক ইউনি-ভার্সিটিই হবে তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত জায়গা।

প্যাভিয়া থেকে সুইজারল্যাণ্ডে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতে লাগল তাঁদেরই অপর জ্ঞাতি-কুটুম্বদের সঙ্গে। ফলে তাঁর এক মামা অ্যাল-বার্টকে একশ' সুইশ্‌ফ্র্যাঙ্ক মাসোহারা দিতে রাজী হলেন। তিনি নিছক পারিবারিক দায়িত্ব থেকেই এ কাজটা করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এ থেকেই কালে একজনের জীবনের অসামান্য সাফল্যের পথ মুক্ত হবে। এক শ' ফ্র্যাঙ্ক মানে বিশ ডলারের চেয়েও কম। তখন-কার দিনেও অর্থ হিসাবে এ অতি যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু একটু বুঝেসুঝে চললে অ্যালবার্ট এ সামান্য অর্থে চালিয়ে যেতে পারবেন।

এরপর বাকি রইল জুরিখে গিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার ব্যাপার। রোদ ঝল্‌মল্‌ এক ভোরে উঠে অ্যালবার্ট সুইজারল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতালী ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁর মনে কিন্তু আল্পস্‌ পর্বতের দেশ সুইজারল্যাণ্ডের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার লোভও কম ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাবনা তখনও তাঁর মনে আসে নি। তাঁর ভরসা ছিল, অঙ্কের দৌলতেই তিনি প্রবেশিকা পার হয়ে যেতে পারবেন।

টেস্ট পরীক্ষার নাম শুনলেই ভয়ানক রাগ হত অ্যালবার্টের। পরীক্ষা পাস করার জন্য বহু কিছু মুখস্থ করে রাখ্‌তে তিনি কিছুতেই রাজী হতেন না। তাঁর প্রথম পরীক্ষা শুরু হতেই মন বিগড়ে গেল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা শুরু হতে এখনও কিছু সময় বাকি ছিল। অ্যালবার্ট ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা আয়ত্ত্ব করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা নিয়েও তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। ফলে তাঁর দুশ্চিন্তা বেড়েই গেল।

শুধু অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাতেই তিনি শান্তি পেলেন। এই দু'টি পরীক্ষায় তাঁর মনে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল

না। তারপর পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া করবার আর কিছুই রইল না।

কিন্তু বেশী দিন তাঁকে অপেক্ষাও করতে হল্‌না। স্কুলের ডিরেক্‌টর হেরজগ একদিন অ্যালবার্টকে ডেকে পাঠালেন অফিসে। কি জন্য তিনি ডাকতে পারেন তা ভাবতেও অ্যালবার্টের সাহস হচ্ছিল না।

কোনরকম ভূমিকা না করেই ডিরেক্‌টর সোজাসুজি বললেন, "আইনস্টাইন, পরীক্ষার ফল অনুসারে তোমাকে এ স্কুলে ভর্তি করা যেতে পারে না।"

অ্যালবার্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল মূর্তির মত। তাঁর চেহারায় কোন ভাবের উদ্রেক হল না, চোখের দৃষ্টি মনে হল ক্লান্ত। তিনি ভাবতে লাগলেন বার বার একই ব্যাপার ঘটছে। তিনি সেখানে পড়বার বা যা জানতে চান তা জানবার যোগ্য নন। কিন্তু কেন যোগ্য নন? কতকগুলো বিশেষ্য আর ক্রিয়াই কি তাঁকে দূরে ঠেলে রাখছে? এরাই কি তার চলার পথে প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়ে দেওয়ায় ডিরেক্‌টর হেরজগ ভাবলেন, অ্যালবার্টের কোন আগ্রহ নেই এ ব্যাপারে। তাতে তিনি রেগে গিয়ে একটু উঁচু গলায় বললেন, "বাস্তবিক পক্ষে তোমার পরীক্ষার ফল এত খারাপ হয়েছে যে তোমাকে এখানে আদৌ ভর্তি করতে পাঠানোই ধৃষ্টতার সামিল।"

অ্যালবার্ট তখন শান্তভাবে জবাব দিলেন, "এ জন্যে আমি সত্যি বড়ো দুঃখিত, স্যার।" তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "আপনার ধৈর্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।" বলেই ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন বেরিয়ে আসবার জন্য।

ছাত্রটির আদব কায়দা ডিরেক্‌টরের মনে রেখাপাত করল। তার সহজ চালচলন মনকে যেন আকর্ষণ করে। তিনি তাঁকে ডাক্‌লেন, "এক মিনিট দাঁড়াও। তোমাকে বলে দিচ্ছি তোমার অঙ্ক আর পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষা কিন্তু চমৎকার হয়েছে। এর উপর নির্ভর করে তোমাকে ভর্তি করে নিতে পারি; অবশ্য তুমি যদি অন্যান্য বিষয়ে সেরে নিতে পার। আমি বলছি কি তুমি বরং প্রিপারেটরী স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও।'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে অ্যালবার্ট বললেন, "হ্যাঁ, স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার।"

বলেই অ্যালবার্ট যখন আবার দরজার দিকে যাচ্ছিলেন তখন ডিরেক্টর তাঁকে ডেকে বললেন, "আরাউ স্কুলে ভর্তি হবার চেষ্টা করগে। প্রিপারেটরী স্কুলে ফিরে যাও।"

প্রিপারেটরী স্কুলে ফিরে যাওয়া! আবার সেই জিমনাসিয়ামের কয়েদখানায় আটক থাকা! সেই একঘেয়েমি আর উগ্রমূর্তি শিক্ষকের শাসানী!

অ্যালবার্ট মনে মনে ঠিক করলেন, না, কিছুতেই তিনি আর স্কুলে ফিরে যাবেন না। এখন তিনি স্বাধীন, এ স্বাধীনতা ছেড়ে স্কুলের কয়েদখানায় ঢুকতে পারেন না। কিন্তু তা'ছাড়া কি-ই বা তাঁর করবার আছে? কিছু রুজি রোজগার না করতে পারলে বাড়ীতেই যে তাঁর ঠাঁই নেই। এখানে এই সুইজারল্যাণ্ডে কোন চাকরি জোগাড় করবেন সে রকম সম্ভাবনাও নেই। একেই তো সেটা বিদেশ তার উপর কোন কাজ তিনি জানেনও না।

এই নিয়ে মনে মনে তিনি অনেক বোঝাপড়া করলেন। অবশেষে একমাত্র পথ, যা তাঁর সামনে ছিল তাই তিনি বেছে নিলেন। অত্যন্ত মনোকষ্টের ভেতর আরাউ রওয়ানা হয়ে গেলেন। গিয়ে সেখানকার জিমনাসিয়ামে ভর্তি হলেন। জুরিখ থেকে আরাউ পঁয়ত্রিশ মাইল পথ।

অবশেষে দেখা গেল তিনি ভাল পথই বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে জীবনে তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন যে স্কুলও আনন্দের জায়গা হতে পারে। আরাউর স্কুলে একঘেয়েমি নেই। ক্লাসে সবকিছু আলোচনা হয় খোলাখুলি। সব বিষয়ের জন্যই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন না। বিজ্ঞানের সবগুলো শাখার জন্যই রয়েছে গবেষণাগার। সেখানে ছাত্রদের অবাধ যাতায়াত। অ্যালবার্ট এতদিন যে সব বিষয় শিখতে পছন্দ করেননি এখন তা অনায়াসে শিখে ফেললেন। তখন বেশ বোঝা গেল, অ্যাল-বার্টের দোষত্রুটি শুধরে নিতে আর সময় লাগবে না।

তাঁর শিক্ষকদের ভেতর একজন ছিলেন অধ্যাপক উইন্টেলার। শান্ত ও পরিশ্রমী ছাত্র অ্যালবার্টকে তিনি একটু সুনজরে দেখতেন। একদিন তিনি অ্যালবার্টকে ডেকে বললেন, "আজকে রাত্তিরে এসে

আমার ওখানে খাবে। কোন বাড়ীর লোকজনদের সঙ্গে এক বিকেল কাটিয়ে এলে তোমার ভালই লাগবে।" এই বলে কৌতুকের হাসি হেসে তিনি আবার বললেন, "লোকজন বলতে আমার কম নয়—সাতটি ছেলেমেয়ে আমার।"

অ্যালবার্ট ছিলেন স্বভাবতই একটু লাজুক প্রকৃতির। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু অধ্যাপক উইন্‌টেলার বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং বললেন, ছুটির পরে এক সঙ্গেই তারা হেঁটে বাড়ী ফিরবেন।

সেই বিকেলটা সত্যিই এত আনন্দের হয়েছিল যে অ্যালবার্ট তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে অধ্যাপকের আনন্দমুখর প্রকাণ্ড বাড়ীর এক শূন্য কামরায় আশ্রয় নিলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই বাড়ীর চালচলনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁরাও গম্ভীর প্রকৃতির এই যুবককে সহজেই চিনে নিলেন, তাঁর লাজুক স্বভাবকে অসামাজিকতা বলে ভুল করেন নি। অনেক সময় তাঁরা তাঁকে এক আধবার সুযোগই দিতেন।

অনেক সময় তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতেন বা চড়াইভাতি করতে যেতেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও আগের মতই তিনি একা একা হেঁটে আনন্দ পেতেন বেশী। এ সময়ই তিনি তাঁর বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়ে চিন্তা করবার সুযোগ পেতেন। সে চিন্তা তখন তাঁর মনের অনেকখানি দখল করে বসেছে। হেঁটে বেড়ানই ছিল তাঁর একমাত্র ব্যায়াম। এ ছাড়া অন্য কোন খেলাধুলায় তিনি ছিলেন যেমন ভীতু তেমনি আনাড়ী।

আরাউতে আসবার সময় তিনি তাঁর বেহালাটি সঙ্গে আনতে ভুলে যান নি। ছোট বেলায় তিনি গানবাজনা কিছু কিছু শিখেছিলেন কিন্তু নিয়মিত তা' অভ্যাস করে যাওয়ার হাঙ্গামা মোটেই ভাল লাগত না তাঁর। তাঁদের বাড়ীর মত অধ্যাপক উইন্‌টেলারের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে বিকেলে গানবাজনার আসর বসত। সেই পরিবারের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই এসে যোগ দিতেন এই আসরে। অ্যালবার্টও স্বভাবতই এসে দলের সামিল হতেন। এমনি করে ধীরে ধীরে গানবাজনার প্রতি তাঁর আসক্তি বাড়তে লাগল। একা একা হেঁটে তিনি যেমন আনন্দ পেতেন ঠিক তেমনি আনন্দ পেতেন বেহালা

বাজিয়ে। তারপর বাকি সারা জীবন এ দু'টি কাজই ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের জন্য অপরিহার্য।

আইনস্টাইনের সঙ্গে উইন্‌টেলার পরিবারের বন্ধুত্ব ক্রমশ আরো নিবিড় হল। ফলে, কয়েক বছর পরেই তাঁর বোন মায়ার বিয়ে হল উইন্‌টেলারের একটি ছেলের সঙ্গে।

পাঁচ

পুরো একটি বছর শেষ হতে না হতেই আইনস্টাইন তাঁর ডিপ্লোমা পেলেন। অবশেষে জুরিখের পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সুযোগ এল। তিনি তৈরি হলেন। যাত্রার সময়ে উইন্‌টেলার পরিবারের সবাই এসে জড়ো হল তাঁকে বিদায় দিতে। স্টেশনে সবাই হাসিঠাট্টা করে স্বভাবত লাজুক অ্যালবার্টের বিদায়ের সময়ে তাঁর মনটি হালকা করে দিল।

একে একে সবাই এসে তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। কেউ কেউ তাঁর পিঠ চাপড়ে, কেউ বা জড়িয়ে ধরে তাঁকে আদর জানাল। বলল, "শীগ্‌গীরই আবার এসে বেড়িয়ে যাবে কিন্তু।"

ট্রেন নড়ে উঠল। আইনস্টাইন জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হেসে হাত নেড়ে নেড়ে সবাইকে বিদায় অভিবাদন জানালেন।

বাড়ী থেকে আরাউ আসবার সময় তাঁর মনে ছিল ভয় ভাবনা, বিপদ আপদের আশঙ্কা। কিন্তু আজ তাঁর মনে সে ভাব আর নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তিনি আজ আরাউ ছেড়ে যাচ্ছেন। আরাউ এসে তিনি ডিপ্লোমা ছাড়াও আরো কিছু পেয়েছেন। ভবিষ্যতের কোন্ পথে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ সহজ হবে তার সন্ধান তিনি এখানেই পান।

বিগত কয়েক মাস একটু অবসর পেলেই আইনস্টাইন সে অবসর কাটিয়েছেন পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে। প্রসিদ্ধ সব পদার্থ বিজ্ঞানীদের

লেখা বই তিনি পড়েছেন। তারপর শিক্ষার একঘেয়েমিকে তিনি পছন্দ করতেন না বলে অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামানো তিনি অনেকটা কমিয়ে দিলেন, কারণ অঙ্কের জন্য 'ফরমুলা' মুখস্থ করতে হ'ত। তাঁর মন চাইত অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে। তাঁর চিন্তার গতি ছিল বরাবরই সামনের দিকে, প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে। তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, পদার্থবিদ্যাই তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দের উৎস।

কিন্তু পদার্থবিদ্যার আসল ভিত্তিই হল অঙ্ক। পরে যখন তিনি অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী বলে খ্যাতি লাভ করেন তখন বিশেষজ্ঞরা তাঁর পাশে থাকতেন জটিল অঙ্ক করে দেবার জন্য। তাঁরা অঙ্ক করে দিতেন আইনস্টাইন করতেন পদার্থবিদ্যার সমস্যার সমাধান।

সেদিন সম্ভবত কেউ অনুমান করতে পারেন নি যে যিনি জুরিখের পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে এসেছেন তিনি ভবিষ্যতের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। ডিরেক্টরদের কাছে তিনি ছিলেন এলোমেলো চুলওয়ালা সাধারণ পোশাকে সজ্জিত এক যুবক। আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত এবং কথাবার্তা বলতেন খুবই কম। এজন্য সবাই তাঁকে বোকা ছাড়া কিছুই ভাবত না। কিন্তু লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন নিখুঁত। এজন্য পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর বেগ পেতে হল না। তখন তাঁর বয়স সতের বৎসর।

একটি লোকের ব্যয় নির্বাহের জন্য একশ' সুইস ফ্রাঙ্ক খুব বেশী কিছু নয়। কিন্তু আইনস্টাইনের জন্য এক শ' ফ্রাঙ্ক ছিল আশি ফ্রাঙ্ক। কারণ, মাসোহারা পেয়েই তিনি বিশ ফ্রাঙ্ক করে জমিয়ে রাখতেন সুইস্ নাগরিকত্ব লাভের জন্য। জার্মানীর তুলনায় এ নতুন দেশটি তাঁর কাছে অনেক ভাল লেগেছে। কাজেই তিনি স্থির করে রেখেছেন, যত শীগ্গীর সম্ভব তিনি সুইস্ নাগরিকত্ব লাভের চেষ্টা করবেন।

ইউনিভার্সিটির কাছে জুরিখের একটি জায়গায় নাম হটিনজেন্। আলবার্ট সেখানে গিয়ে সবচেয়ে কম ভাড়ার একটি কামরা নিয়ে বাস করতে লাগলেন। ঘর ভাড়া দিয়ে যা হাতে থাকত তা তিনি আহারের জন্য ব্যয় করতেন ছোট কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর রেস্তোরাঁয় গিয়ে। খাওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনদিনই বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না

বরং অনাহারেই অনেক সময় কাটিয়ে দিতেন। কোথায়ও যাতায়াতের কাজে যানবাহনের খরচ তাঁর কিছুই ছিল না কারণ তিনি পায়ে হেঁটেই সর্বত্র যেতেন। পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি তিনি যে রকম মনোভাব পোষণ করতেন তাতেও তাঁর আর্থিক সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়েছিল। তাঁকে কি রকম দেখাচ্ছে এই নিয়ে কখনো তিনি মাথা ঘামাতেন না এবং মনে মনে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর চেহারা নিয়ে অপরেরও মাথা ঘামানোর কোন কারণ নেই।

জুরিখ ছিল তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ একটি শিক্ষাকেন্দ্র। পৃথিবীর নানাদিক থেকে ছাত্ররা এখানে এসে জমায়েত হত জ্ঞানান্বেষণের জন্য। এমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর আইনস্টাইন তাঁর চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা আর প্রশ্ন নিয়ে স্বভাবতই নিজকে স্বাধীন ভাবতে পারলেন। মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য এখানে এমন সব লোক তিনি পেলেন যাঁরা অনায়াসে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন এবং তাঁদের নিজের মনেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ক্লাসে হাজির হতেন অনিয়মিতভাবে। যে সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ কম সে সব বিষয় তিনি অবহেলা করতেন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত পদার্থ বিদ্যার গবেষণাগারে অথবা নিজের ইচ্ছেমত পড়াশুনা করে।

জুরিখের কোন সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁকে কখনো অংশ নিতে দেখা যেত না। তিনি সাধারণত কারো বাড়ী বেড়াতেও যেতেন না, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করবারও আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। মনে হয় চিন্তাশীল গম্ভীর প্রকৃতির লোকদের সঙ্গেই ছিল তাঁর চেনাজানা। ঐ ধরনের বন্ধুরাই আনন্দ পেত তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে, অপরে তাঁর সঙ্গে মিশতে আগ্রহ প্রকাশ করত না। তাঁর সংযত ব্যক্তিত্বের ফলে লোকে তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হত না। তাঁর করণীয় এত কিছু ছিল এবং সে সম্বন্ধে ভাববারও এত বেশী ছিল যে নিজের কাজ ছাড়া অন্য কোন দিকেই তিনি মনোযোগ দিতে পারতেন না।

তাঁর জীবনে শুধু গানবাজনা একটু স্থান দখল করে নিয়েছিল। সময় সময় খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তিনি কন্‌সার্ট শুনতে যেতেন। নিজের বেহালাটি বাজিয়েও তিনি আনন্দ পেতেন।

সেদিন পলিটেকনিকের কেউ ধারণাই করতে পারেননি যে, এমন একজন অসামান্য লোক তাঁদের ভেতরে রয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য

ছিলেন যাঁরা জানতেন যে, নম্র প্রকৃতির এই যুবকের মনটি বড় চমৎকার। অধ্যাপক মিনকয়োস্কি পড়াতেন উচ্চতর গণিতের ক্লাসে। তিনি আইনস্টাইনকে তাঁর ক্লাসে হাজিরা দিতে বলতেন কিন্তু আইনস্টাইন তাতে কখনও কোন আগ্রহ দেখাতেন না। কয়েক বছর পরে কিন্তু এই অধ্যাপকটিই আইনস্টাইনকে সাহায্য করেছেন বহু জরুরী গণিতের কাজে।

আইনস্টাইনের একটি সহপাঠীর নাম ছিল মার্সেল গ্রস্‌ম্যান। তিনি আইনস্টাইনের খুব প্রশংসা করতেন। আইনস্টাইন একবার অপ্রত্যাশিতভাবে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন এই সহপাঠীটির কাছ থেকে। নিত্যকার মতই একদিন দু'ই সহপাঠী মিলে অনেক বই পুস্তক বের করে মার্সেলের কামরায় বসে বিজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সেদিন ছিলেন একটু অন্যমনস্ক। সেদিন ছিলেন তিনি চুপচাপ। কোনকিছু বলবার আগ্রহই তাঁর সেদিন ছিল না।

মার্সেল দেখলেন, কোন কাজই হচ্ছে না, আলোচনা সবই হচ্ছে এক তরফা। অবশেষে তিনি উঠে বললেন, "ওহে, আজকের ব্যাপারে তোমার একটুও আগ্রহ নেই দেখতে পাচ্ছি। এ আলোচনা আরেক দিন করা যাবে।"

আইনস্টাইন শুধু মাথা নাড়লেন মুখে কোন জবাব দিলেন না।

মার্সেল বিস্ময় বোধ করলেন। বন্ধুটি আজকে হয়ত সুস্থ নয়। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, "চলো কাফে সুইজার হোফে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খেয়ে আসি।" তাঁর ধারণা আইনস্টাইন অনেকক্ষণ কিছুই খান নি।

রেস্তোরাঁয় গিয়ে মার্সেল শুধু কফিরই অর্ডার দিলেন না, সেই সঙ্গে মাংস ও গোল আলুও চেয়ে নিলেন। আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে বসে সে সব খেলেন অন্যমনস্কভাবে। কথায় কথায় মার্সেল বলে উঠলেন, "আসছে সপ্তাহে আমাদের পরীক্ষা, নয় কি?"

আইনস্টাইন প্লেট থেকে চোখ তুলে তাকালেন। পরে বললেন "হ্যাঁ, পরীক্ষা। পরীক্ষার নাম শুনলে কী ভয়ই না পায় আমার। পরীক্ষার মত এমন বিশ্রী কাজ আর কিছুই নেই। রাতদিন শুধু পড়া মুখস্থ করে করে মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখা। মাথার উপর

ঝুলছে পরীক্ষায় কুঠার যথা সময়ে সে আমার ঘাড়ে পড়বে, আমাকে করবে পলিটেকনিক ছাড়া।"

ধীর স্থির প্রকৃতির বন্ধুর মুখে হঠাৎ এ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মার্সেল বিস্মিত হলেন। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বললেন, "খাওয়া সেরে চলো আমার সঙ্গে আমার কামরায়। তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।"

উপরে উঠে মার্সেল আইনস্টাইনকে ডেস্কের পাশে বসালেন। বসিয়ে ডেস্কের উপর নোট বইয়ের পর নোট বই সব বের করে দেখাতে লাগলেন। যে সব ক্লাসে তিনি কখনও যাননি, সে সব ক্লাসের দেওয়া বিস্তৃত নোট।

আইনস্টাইন পরীক্ষায় পাস করলেন। চার বছর তিনি পলিটেকনিকে ছিলেন। সবগুলো পরীক্ষাই তিনি পাস করলেন মার্সোলের সুন্দর ও নিখুঁতভাবে লেখা সব নোট পড়ে। অনিচ্ছায় ক্লাসে যোগ দেবার অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে অ্যালবার্টকে রক্ষা করল এই নোটগুলো। শুধু যে অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে রক্ষা করল তা নয়, তাঁর পরীক্ষা পাসেও সাহায্য করল। কারণ, তখন তাঁর জীবনের প্রকৃত কাজ শুরু হয়ে গেছে।

আইনস্টাইনের ক্লাসে ছিলো এক সহপাঠিনী। মাথায় তাঁর কাল চুল। সাইবেরিয়া থেকে এসেছেন বিজ্ঞান পড়তে। দেখতে বেঁটে, গোলগাল, আলবার্টের কাঁধ সমানও নয়। মেয়েটির চোখ দুটি কাল, দৃষ্টিতে প্রসন্নতার অভাব। তাঁকে হাসতে দেখা যায় কৃচিৎ। নাম তাঁর মিলেভা মরিস। তিনিও এসে যোগ দিতে লাগলেন অ্যালবার্ট ও মার্সেলের আলোচনা বৈঠকে। কথা কম বললেও তিনি আলোচনা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। এ জন্য আইনস্টাইন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। একজন মানুষ পেলেন মনের কথা বলবার জন্য। আইনস্টাইন যখন কথা বলতেন, মিলেভা তখন তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন হাতের উপর চিবুকের ভর রেখে আর মাঝে মাঝে সায় দিয়ে যেতেন বা প্রশ্ন করতেন।

তারপর পলিটেকনিকে যখন তাঁদের তৃতীয় বর্ষ চলছে তখন মিলেভা ও আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন, তাঁদের দু'জনার বিয়ে হবে ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ হলেই।

ছয়

. উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে বিংশ শতাব্দীর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বয়স তখন একুশ এবং তিনি সুইজারল্যাণ্ডের একজন নাগরিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের চতুর্থ বর্ষ শেষ হয়েছে। এই ক'বছরে তিনি যে শুধু নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন তাই নয়, স্বাধীন ভাবে কাজ করবার এবং চিন্তা করবার আনন্দও তিনি উপভোগ করেছেন। এতদিনে তিনি অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রসারতা লাভ হয়েছে।

যেদিন তিনি পলিটেকনিক থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হলেন সেদিনই বাড়ী থেকে এল দুঃসংবাদ, এরপর তিনি আর সেই একশ' ফ্রাঙ্ক মাসোহারা পাবেন না।

এতদিনে আইনস্টাইনকে মুখোমুখি আসতে হল কঠোর বাস্তবের সঙ্গে। একথা সত্যি যে, নিজের খাওয়া পরার জন্য তিনি মাথা ঘামাতেন খুব কম, এবং অন্য ছোটখাট প্রয়োজনের দিকেও মনোযোগ দেবার কথা ভাবতেন না। কিন্তু খাওয়া পরার প্রয়োজনীয়তা মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। তা'ছাড়া বিয়ে করতে চাইলে কিছু উপার্জনের একটা পথ চাই-ই। আইনস্টানকে বিয়ে করা সম্বন্ধে মিলেভা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বাড়ী ফিরে গিয়ে তিনি বিয়ের দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এ সময়ে আইনস্টাইন যদি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকদের সহকারী হিসাবে একটা চাকরির চেষ্টা দেখতেন তা'হলে তা অস্বাভাবিক কিছু হত না। ভাল ছাত্রদের মধ্যে যারা নিজের লাইনেই থাকতে চায়, তারা গ্রাজুয়েট হবার পরে সাধারণত তাই করে। তাতে কোনরকমে নিজের খাওয়া-পরা চালিয়ে যাবার সুযোগ সহজেই হয়। তার

চেয়েও বড় কথা হল, এতে সে ছাত্রের ভবিষ্যতে অধ্যাপক হবার পথও সুগম হয়।

আইনস্টাইন এমনি একটা চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিতই ছিলেন। তাঁর অধ্যাপকরাও বরাবর এ ব্যাপারে তাঁকে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তখনই এমন কোন পদ খালি ছিল না। যেখানে যা যার কাছেই আইনস্টাইন চাকরির জন্য গেলেন সেখান থেকেই ফিরে আসতে লাগলেন। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিলেন কেউ কেউ দিলেন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশা। বর্তমানের জন্য কেউ কিছুই করলেন না।

স্বভাবতই আইনস্টাইন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন। কেন এমন হচ্ছে? তিনি বেশ জানেন, একাজের যোগ্যতা অপরের চেয়ে তাঁরই অনেক বেশি। মনে মনে তিনি ভাবেন, "এরা কি আমাদের বিদেশী ভেবে এ রকম করছে? কিন্তু আমি তো নাগরিকত্ব লাভ করেছি। আমি তো এখন রীতিমত একজন সুইস্ নাগরিক। অবশ্য জাতে আমি ইহুদী এবং এ স্বাধীন দেশেও সেটা আমার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হয়তো এটাও অসম্ভব নয় যে, তিনি ইহুদী বলেই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, নিজেদের অজ্ঞাতেই অধ্যাপকরা ভয় করতেন যে এ অসাধারণ যুবক একদিন হয়তো আমাদের ছাড়িয়ে যাবেন। কারণ, অ্যালবার্ট তাঁর ব্যবহারে যদিও ছিলেন নম্র ও ভীরু প্রকৃতির তবু বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপকদের চ্যালেঞ্জ দিতেও ইতস্তত করতেন না। আইনস্টাইনের সূক্ষ্ম ধারণা দেখে অনেক সময় তাঁরা বিস্ময় বোধ করতেন।

কিন্তু এভাবে তাঁকে এখন দূরে রেখেও পরিণামে ফল বিশেষ কিছুই হল না। কয়েক বছরের মধ্যেই এ অধ্যাপকরা দেখলেন, জরুরী তাগিদ দিয়ে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে ফিরিয়ে আনা হল তাঁদের উপরস্থ বিশেষ একটি পদে।

চাকরির জন্য আইনস্টাইন, রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, খবরের কাগজের প্রতিটি কর্মখালী বিজ্ঞাপনের জবাব দিতেন এবং কোথাও চাকরি খালির আনন্দের কানাঘুষা শুনলেই সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। অবশেষে জীবনের প্রথম চাকরি তিনি পেলেন। উইনটারথার

শহরের একটি টেকনিক্যাল স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হল আইনস্টাইনকে।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা মধুর হল না। তিনি ক্লাসে গিয়ে ঢুকতেই ছাত্ররা সব চুপচাপ হয়ে থাকত। ক্লাসের এখানে ওখানে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত দু'একটি ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে অনেকের বয়স ছিল তাঁর চেয়ে বেশী, পোশাকে-পরিচ্ছদেও তারা ছিল তাঁর চেয়ে বেশী কেতাদুরস্ত। তারা ভাবত, যেন তেন প্রকারের পোশাক পরা এই সরল যুবকটি তাদের একটি আনন্দের বস্তু। হ্যাঁ, অধ্যাপক তিনি নন, বোবা একটা গর্দভ।

"গুড মর্নিং" ডঃ আইনস্টাইন ভয়ে ভয়ে বললেন।

পিছনের বেঞ্চ থেকে একটি ছেলে নাক দিয়ে ঘোড়ার মত শব্দ করল। অপর ছেলেরা শব্দ করে পা দাপাতে লাগল। একজন কাগজের একটা ছোট্ট পুঁটুলীই ছুঁড়ে মারল।

ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে ফিরে আইনস্টাইন এক টুকরো খড়িমাটি হাতে নিলেন। এই ছেলেদের পদার্থবিদ্যা শেখানোর জন্যই তাঁকে মাইনে দেওয়া হয়। ছেলেরা মনোযোগ দিক বা না-দিক তিনি তাদের কয়েকটি প্রেব্লেম বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। চিত্র এঁকে তিনি বোঝাতে আরম্ভ করলেন। এতক্ষণে তিনি যেন রেহাই পেলেন, কারণ, পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলে তিনি বাইরের আর কিছুই শুনতে বা দেখতে পান না।

ধীরে ধীরে গোলমাল কমে আসে। শিক্ষকের মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর ছাত্রদের কানে প্রবেশ করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা মনোযোগী হয়ে ওঠে। ঘণ্টার শেষের দিকে তাদের শিখবার আগ্রহ বাড়ে, শিক্ষকের প্রতিও শ্রদ্ধা বাড়ে। তারপর স্থায়ী শিক্ষকটি সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আইনস্টাইনের বিদায়ের সময় হল। ছেলেরা তাঁকে বিদায় দিয়ে সত্যিই দুঃখিত হল।

এখন কয়েকটি ফ্রাঙ্ক আইনস্টাইনের সম্বল। এই দিয়ে আবার কিছুদিন চাকরি খুঁজে বেড়ান যাবে। কিন্তু আরেকটি চাকরি পেতে পেতে বেশ কয়েক বেলা তাঁকে না খেয়েই কাটিয়ে দিতে হল। এবার চাকরি হল স্যাফহোজেনের এক বোর্ডিং স্কুলের দুটি ছাত্রের গৃহশিক্ষক হিসাবে। কাজটা তাঁর পছন্দ হল, ছেলেরাও বেশ উন্নতি করছে দেখা গেল। তিনি তখন প্রস্তাব করলেন, নিজের ইচ্ছেমত সব বিষয়ে

ছেলেদের পড়াবার। এ প্রস্তাবটা বিবেচিত হল বিদ্রোহ বলে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হল বিদ্রোহী শিক্ষককে।

তিনি ফিরে এলেন জুরিখে। আবার শুরু হল সেই ঘোরাফেরা। এবার কিন্তু পেটের ক্ষুধা তাঁকে জ্বালাতন করতে লাগল। ক্ষুধায় অনেক সময় তিনি দুর্বলতা বোধ করতে লাগলেন। যে কোন রকম একটা চাকরির চেষ্টা তিনি করতে লাগলেন। কিন্তু এমন দুঃসময় যে দেখতে রোগা, ছেঁড়াফাটা পোশাক পরা যুবকটির কোন কাজই জুটল না। তা'ছাড়া তিনি আবার সুইডেনের খাঁটি নাগরিক নন।

তিনি নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, একেই তো বলে পিছু ধাওয়া। জীবনে উন্নতির জন্য টাকা পয়সার পিছু ধাওয়া কোনদিনই আমি চাই নি। আমি চাই অতি সাধারণ কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে জুতো সেলাই করতেও আমি রাজী। আমার ইচ্ছে হয় শূন্যের উপর এমন একটা দ্বীপে গিয়ে বাস করি যেখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, ব্যক্তিগত প্রয়োজন বলেও কিছু নেই, যেখানে শুধু চিন্তাই সবকিছু।

সময় সময় তিনি দেখা করতেন পুরাতন সহপাঠীদের সঙ্গে। কিন্তু তারা বন্ধুর জন্য কিছুই করতে পারত না। অবশেষে বন্ধুর অর্থকষ্টের কথাটা মার্সেল গ্রসম্যানের কানে পৌঁছল। সরকারী মহলে মার্সেলের বাবার বেশ কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বার্নের প্যাটেণ্ট অফিসের ডিরেক্টারের অফিসে একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্নে যাবার ট্রেনভাড়া ধার দিলেন বন্ধু মার্সেল।

অন্য যে কেউ হলে বেশ ফিটফাট হয়ে চাকরির জন্য দেখা করতে যেত। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ব্যাপার স্বতন্ত্র। পোশাক-পরিচ্ছদ বা নিজের চেহারার পারিপাট্য বিধান কোনদিন তাঁর ধাতে সয় না। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় আর উস্‌কোখুস্‌কো এক মাথা চুল নিয়ে তিনি গিয়ে ঢুকলেন ডিরেক্টরের অফিসে। নির্দেশ মত একখানা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন।

হাবভাব দেখে ডিরেক্টর হলার স্বভাবতই নিরাশ হলেন। চাকরির জন্য যে সব যুবকদের মিঃ গ্রসম্যান সুপারিশ করে পাঠান সাধারণত তারা থাকে যেমন চট্‌পটে তেমনি পরিপাটি। কিন্তু এ যুবকটি-----

তিনি সহসা জিজ্ঞেস করলেন, "প্যাটেণ্ট সম্বন্ধে তুমি কি জান ?"

অ্যালবার্ট গম্ভীর ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিলেন, "কিছুই জানি না।"

মিঃ হলার অবাক হলেন। সত্যিই কি এ যুবক চাকরি চায় ? মিঃ গ্রসম্যান লিখেছেন, যুবকটির একটি চাকরি নিতান্ত দরকার, তা ছাড়া দেখেও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারে সে আদৌ চাকরির উমেদারদের মত তো নয়। তারা হয় সদা সতর্ক এবং খুশী করতে ব্যস্ত। একে মনে হচ্ছে একেবারে নির্লিপ্ত। হ্যাঁ, মিঃ গ্রসম্যান উল্লেখ করেছেন, যুবকটি একজন অসাধারণ জ্ঞানী ; কাজেই----

মিঃ হলার আবার বললেন, "ডঃ আইনস্টাইন, এখানে যখন কেউ তার আবিষ্কার প্যাটেণ্ট করতে দরখাস্ত করেন তখন তিনি সেই আবিষ্কারের একটা টেক্‌নিক্যাল রিপোর্ট পাঠান। সাধারণত সেই সঙ্গে থাকে ড্রয়িং এবং প্ল্যান। এখানে কাজ হল, দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করে দেখা, আবিষ্কার কার্যকরী কিনা তা দেখা এবং সবশেষে দরখাস্তটা সাধারণ ভাষায় সকলের বোধগম্য করে পুনরায় লেখা।"

মিঃ হলার থামলেন। তাঁর কাজের ব্যাখ্যার যুবকটির মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় তাই লক্ষ্য করতে লাগলেন। আইনস্টাইন নির্বিকার ও নিরুত্তর। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে মিঃ হলার আবার আরম্ভ করলেন, "যা বললাম এ ধরনের কাজ করবে তুমি।"

আইনস্টাইন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর এ নীরবতায় মিঃ হলার বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন আইনস্টাইন সহসা মাথা তুলে বললেন, "এ ধরনের কাজ নিশ্চয়ই আমি করতে পারব।" নিশ্চিন্তভাবে কথা কয়টি বলে আইনস্টাইন এমনভাবে হাসতে লাগলেন যে, মিঃ হলারও খুশী না হয়ে পারলেন না।

দু'জনার ভেতর কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তারপর মিঃ হলার বললেন, "চাকরি দেবার আগে আরও দু'একটি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

আইনস্টাইনের উৎসাহ আবার কমে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার আবার সেই পুরানো কথা। তিনি জন্মাবধি সুইস্ না ইহুদী তাই হয়ত এবার জিজ্ঞেস করবেন।

"তুমি কি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক ?"

"হ্যাঁ, স্যার"। অ্যালবার্ট পকেটে হাত দিয়ে কাগজপত্র বের করলেন। তাতে স্পষ্টই লেখা রয়েছে, জন্ম জার্মানীতে হলেও যথারীতি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন আইনস্টাইন।

"বেশ।" কিছুক্ষণ থেমে মিঃ হলার বললেন, "আমি তোমাকে দেব বার্ষিক তিন হাজার ফ্রাঙ্ক। কাজ শুরু করতে হবে এখন থেকেই। তুমি খুশী?"

"হাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার?"

অনেক তরুণ বিজ্ঞানির জন্যই এরকম একটি চাকরি ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আইনস্টাইনের বেলা তা নয়। কাজেই তাঁর ভেতর কোন উত্তেজনার ভাব দেখা গেল না, তিনি কৃতজ্ঞতায় পঞ্চমুখ হয়েও উঠলেন না। তিনি একটা চাকরি চেয়েছিলেন, চাকরিটা পেয়ে গ্রহণ করলেন।

সাত

সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন শহরের একটি বাড়ীর চারতলায় সংসার পেতেছেন অ্যালবার্ট ও মিলেভা আইনস্টাইন। ছোট একটি কামরা, অতি সাধারণ আসবাবপত্রে সজ্জিত কিন্তু তা'হলেও এখান থেকে আর নদীর দৃশ্য সত্যিই মনোরম। তা'ছাড়া পরিষ্কার দিনে তাঁরা ঘরে বসেই দেখতে পান আল্পস্ পর্বতের জাঁকাল চূড়া।

প্যাটেণ্ট অফিসের কেরানী হিসেবেই অ্যালবার্ট বেশ খুশী. ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটে ডেস্কে বসে প্ল্যান আর আবিষ্কার সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গ তাঁর ভালই লাগে। আগেই বেরিয়ে গেছে এমন কোন জিনিস নকল হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তাঁকে এবং আবিষ্কারক যা বোঝাতে চাইছেন তাতেও মনোযোগ দিতে হয়। মিঃ হলার শীগ্‌গীরই বুঝতে পারলেন যে, নতুন লোকটি আর যাই হোক অযোগ্য নয়। জটিল প্ল্যানগুলো আইনস্টাইন বুঝতে পারেন অনায়াসে। কোন কিছুই তাঁর পক্ষে

খুব কঠিন নয়, আর অকেজো বলে কিছুই তিনি ফেলে রাখেন না। তাঁর ডেস্কে যেসব আবিষ্কারের ব্যাপার আসত তার প্রতিটিই ছিল কোন না কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির অবদান, কাজেই আইনস্টাইনের চোখে তা ছিল শ্রদ্ধার বস্তু।

শীগ্‌গীরই তিনি বুঝতে পারলেন, দিনের কাজ তিনি অনায়াসে দু'তিন ঘণ্টায় সেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু সহকর্মীদের স্বার্থের খাতিরে সে কথা মিঃ হলারের কাছে প্রকাশ করবার উপায় নেই। কারণ, একাজের জন্যই তাঁর সহকর্মীদের সময় লাগে বেশী, পরিশ্রমও করতে হয় বেশী। মিঃ হলারকে কিছু না বলে তিনি তাঁর নিত্যসাথী বিজ্ঞান বিষয়ক কাজে সময়টা ব্যয় করতে লাগলেন। তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারে একটি ফাইল রাখা ছিল, কেউ ধারে কাছে আসতে দেখলেই, হিজিবিজি লেখায় ভর্তি কাগজ তিনি লুকিয়ে ফেলতেন ফাইলের তলায়।

আইনস্টাইনের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া। সে আকাঙ্ক্ষা এখন আরও অদম্য হয়ে উঠল। খাওয়া-পরার সামান্য প্রয়োজন চাকরি করেই মিটে যাচ্ছে। তার বাইরে আইনস্টাইনের সব কিছু ভাবনা ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপর। আলো, গতি, মহাশূন্য ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন আজব সব কথা। মনের সে সব কল্পনা এত অপ্রচলিত যে তার কোন নামও হয় না। তাঁর এ কাজ সম্বন্ধে কথা উঠলে আইন-স্টাইন তাঁর চিন্তাকে সময় সময় বলতেন, আপেক্ষিকবাদ বা রিলেটিভিটি। তখন তিনি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারেন নি যে, এ শব্দটিই কালে বিজ্ঞান জগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রতীকে পরিণত হবে তা নয়, দৈনন্দিন ব্যাপারেও স্থান হবে।

যতই দিন যেতে লাগল আইনস্টাইন ততই তাঁর আপেক্ষিকবাদ তত্ত্ব নিয়ে বেশী করে চিন্তা করতে লাগলেন। কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিকও এসে মিলিত হতেন নদীর তীরে আইনস্টাইনের বাসগৃহে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালীয়ান ইঞ্জিনিয়ার বেসো, রুমানিয়ার ছাত্র সলোভিন আর ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের গণিতজ্ঞ কনরেড হ্যাবিচ্। বয়সে তাঁরা সবাই ছিলেন তরুণ, মন ছিল তাঁদের নানা রকম উদ্ভাবনী চিন্তায় ভরপুর। যদিও তাঁরা জানতেন যে, আইনস্টাইনের সঙ্গে

অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের মতামতেরই গরমিল রয়েছে তবু তাঁরা আইনস্টাইনের মতকে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন।

এসময়ে আইনস্টাইনের এক পুত্রের জন্ম হল। তখন তরুণ বিজ্ঞানীদের সে ঘরে আসতে হ'ত ছেলের সব তোয়ালে শুখাবার জন্য টাঙানো দড়ি এড়িয়ে। আইনস্টাইন নিজেও শিশুকে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে যেতেন অনেক দূর অবধি। তিনি ডেস্কে বসে যেমন চিন্তা করতেন ঠিক তেমনি চিন্তা করতে পারতেন ছেলের গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াবার সময়। হাসিখুশি এক ভদ্রলোক ঘুমন্ত একটি শিশুর গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—আশ-পাশের লোকের কাছে নিত্যকার দৃশ্য হয়ে উঠল।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র এডওয়ার্ডের যখন জন্ম হল, আইনস্টাইন তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিশেষভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছেন। প্যাটেন্ট অফিসের কাজটা তখন বিশ্রামের ব্যাপার বললেই চলে। বাকি যে সময়টা তিনি জেগে থাকতেন, সব সময়েই তিনি চিন্তা করতেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান নিয়ে, যে সমাধান মনে হত তাঁর নাগালের বাইরে। তিনি বড় বড় সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করতেন এবং তাঁদের মতের সঙ্গে অনেকাংশেই একমত হতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করতেন বেসো, হ্যাবিচ এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে। যে সব বৈজ্ঞানিক মত ইতিপুর্বেই যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তার বিরোধিতা করতে স্বভাবতই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

যত দিন যেতে লাগল আইনস্টাইনের মানসিক চিন্তা ততই কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। অনেক বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা পরিচালনা করেন গবেষণাগারে আর তিনি গবেষণা করেন আরও বেশী চিন্তার ভেতর। তাঁর বিশাল মনটাই ছিল একটা গবেষণাগার এবং সেখানে যে কাজ হতো তা' ছিল বিস্ময়কর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ধীরস্থির, অনেক সময় উদাসীন এবং বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে পুরোপুরিই উদাসীন। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে তিনি ছিলেন স্থিরচিত্ত এবং নির্ভীক।

১৯০৫ এর জুন মাসে একদিন উসকোখুস্কো চুলওয়ালা এক যুবক বার্নের পোস্টাফিসে গিয়ে কেরানীর হাতে মোটা একটি

ম্যানিলা এনভেলাপ দিলেন ওজন করে ডাকটিকেট লাগিয়ে দিতে। এনভেলাপটির উপরে জার্মানীর লিপজিগ শহরের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'আনালেন দর ফিসিক' পত্রিকার ঠিকানা লেখা। পাঠাতেও খরচ কম লাগল না, কারণ এনভেলাপের ভেতরে রয়েছে ত্রিশ পাতা কাগজ ঘন হাতের লেখায় ভর্তি। যুবক ডাকমাশুলের পয়সা গুণে দিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর বিগত কয়েক বছরের চিন্তার ফলের একটা বিবরণী এইমাত্র ডাকে দিয়ে এসেছেন। মহাশূন্য, কাল ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে তিনি এতদিন ধরে যা চিন্তা করে স্থির করেছেন তাই সহজ ও সুস্পষ্ট ক'রে লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই হয়ত সেদিন বুঝতে পারেন নি যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-জগতে তার এই নতুন চিন্তাধারা কি আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

আজ আইনস্টাইন বড় ক্লান্ত। অতি ধীরভাবে সিঁড়ি অতিক্রম করে তিনি তার চারতলার ঘরে গিয়ে উঠলেন। ছেলেরা আগেই ঘুমিয়ে আছে। আইনস্টাইন গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মিলেভা তার বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। মিলেভা সব সময়েই যেমন বদমেজাজী তেমনি খাম-খেয়ালী। তার উপর বার্নে বাস কালে দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে আইনস্টাইনের উদাসীনতা দেখে সে হয়ে উঠেছে কলহপ্রিয় ও কোপনস্বভাবা। আইনস্টাইনের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে সে বলে উঠল, "তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে----ডাক্তারকে ডাকি ?"

তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "না, না, আমি এমনিই একটু ক্লান্তি বোধ করছি। ও কিছুই না। আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।"

তার ভেতর উত্তেজনার কোনো ভাব নেই একটা কঠিন কাজ সমাধা করার যে আনন্দ তাও নেই। যে সব কাগজপত্র এইমাত্র তিনি ডাকে ফেলে দিয়ে এলেন তার ভেতর রয়েছে তাঁর অশেষ মানসিক শ্রমের ফল। এ কাজ সমাধা করতে তাঁকে যে শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে কোনো কয়লাখনিতে কাজ করেও ঠিক ততটা করতে হতো না।

প্যাটেন্ট অফিসের কাজ থেকে আইনস্টাইন কয়েকদিনের অবসর নিলেন ক্লান্তি দূর করার জন্য। কিন্তু তাঁর মনের কাজ চলতেই

লাগল, কারণ তাঁর অনেক কিছু করতে তখনও বাকি। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর চিন্তার ফল কি ভাবে গৃহীত হবে তা' তিনি আদৌ ভাবতেন না। তিনি জানেন, তিনি যা ছাপাতে পাঠিয়েছেন তাই সত্যি। দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে তিনি যা স্থির করেছেন, তা'কে তিনি মনে করতেন দিবালোকের মতই সত্য বলে। এমন কোন শক্তি নেই যা তাঁর সেই দৃঢ় ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

তাঁর মতবাদ ছাপা হয়ে বের হল। বার্লিনে, প্যারিসে, লণ্ডনে -- এক কথায় ইউরোপের সর্বত্রই বৈজ্ঞানিকরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে তা পড়লেন। এ মতবাদ যে মৌলিক এবং পুরাতনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কৌতূহলী পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কে এই 'আইনস্টাইন' যিনি চিন্তায় এমন সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার খোজ-খবর জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন? গবেষণা কাসই বা কোথায় চালিয়েছেন? এমন একজন লোকের সম্বন্ধে এতদিন কিছুই জানা জানতে পারেন নি এটাই বা কেমন ব্যাপার?

এই 'আইনস্টাইন' বার্নের প্যাটেন্ট অফিসের একজন অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানী। প্রতিদিন নিয়মিত তিনি অফিসে গিয়ে প্যাটেন্ট সংক্রান্ত দরখাস্ত পড়েন এবং সকলের অজ্ঞাতে হিজিবিজি কি সব লেখায় ভর্তি কাগজের টুকরো নিজের ডেস্কে একটা ফাইলে লুকিয়ে রাখেন।

আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা পদার্থবিদ্ স্থির করলেন, প্রবন্ধের লেখকের সঙ্গে দেখা করবেন, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। অধ্যাপক ম্যাকস ভন লাউ ট্রেনে উঠে বার্নে চলে এলেন। রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই ছিল ছোট্ট একটি রেস্তোরাঁ। আইনস্টাইনের সঙ্গে সেখানেই তিনি দেখা করলেন।

একজন ক্ষুদ্রাকৃতি লোক দাঁড়িয়ে অধ্যাপক ভন লাউকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাই দেখে তিনি বিস্মিত না-হয়ে পারলেন না। যিনি উঠে দাঁড়ালেন, মনে হয়, তিনি সবে মাত্র কৈশোর পার হয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে যুবা বৃদ্ধ বা সুন্দর অসুন্দরের কোনো তারতম্য নেই। বার্লিনের সেই খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং বার্নের প্যাটেন্ট অফিসের কেরানী মনের খুশীতে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। অস্ট্রিয়ার স্যালয়াবার্গে বিখ্যাত সব বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এল আইনস্টাইনের কাছে। স্বভাবতই তিনি খুব খুশী হলেন। এতগুলি খ্যাতনামা লোকের কাছে নিজের মতবাদ প্রকাশের এ সুবর্ণ সুযোগ তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। জীবনে এই প্রথম তিনি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে উপস্থিত হতে যাচ্ছেন।

তিনি যখন পণ্ডিত-জনের সম্মুখে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন তখনও তাঁর গায়ে সেই কোঁচ্‌কানো কদাকার পোশাক মাথায় এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। কিন্তু কথা বলতে আরম্ভ করতেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা সবাই উপলব্ধি করছিলেন যে, এ যুবক তাঁদের সামনে প্রকৃতির এক বিপুল রহস্যের দ্বার খুলে দিচ্ছেন। এমন এক রাজ্যে তাঁর মন বিচরন করছে, এর আগে যা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

অতঃপর আইনস্টাইন আবার ফিরে এলেন তার প্যাটেন্ট অফিসের কাজে। কাজটি তাঁর পছন্দসই, কাজেই, তিনি তা ছাড়তে পারেন না। সাধারণ লোকেরা তাঁর মতবাদে কোনো আগ্রহ দেখাত না, কারণ তখনও বিজ্ঞান সাধারণের ভেতর এতটা প্রসার লাভ করেনি। কাজেই শুধু পণ্ডিত সমাজেই আইনস্টাইনের এই মতবাদ আলোড়নের সৃষ্টি করল। জুরিখে ত্রাসের সঞ্চার হল। এই ব্যক্তি পলিটেক-নিকের গ্রাজুয়েট। তিনি এখানকার একজন অধ্যাপক কেনো হলেন না?

আইনস্টাইনকে হাতের কাছে পেয়েও তাঁকে অধ্যাপক করে না রাখায় সবার কাছে তাঁরা বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠলেন।

পলিটেকনিকের তুলনায় জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছোট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টররা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন আইনস্টাইনকে নেবার জন্য। সৌভাগ্যক্রমে একজন সহকারী অধ্যাপকের পদ খালিও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ডঃ ক্লিনার আইনস্টাইনকে সেই পদে নেবার প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুটা জটিলতার উদ্ভব হল। সেখানে কারও পক্ষেই সরাসরি অধ্যাপক পদে যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথা অনুযায়ী কিছুদিন সবাইকে সেখানে সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করতেই হবে। এ কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কিছুই পান না—যে সব ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে পড়বে তারাই ফি দেবে।

আইনস্টাইনকে নিয়ে বাইরে এত আলোচনা হলেও তিনি নিজে কিন্তু ছিলেন একেবারেই নির্লিপ্ত। একজন সহকারী অধ্যাপক পদে জুরিখে যেতে মোটেই রাজী নন। তাঁর পক্ষে এ চাকরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার উপরে রয়েছে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর প্যাটেণ্ট অফিসের চাকরিই ভাল। তাঁর নিজের কোন উচ্চাকাঙক্ষাও নেই। তিনি চান শুধু একটু নিরিবিলিতে থাকবার সুযোগ। নিজের' কাজে মনোযোগ দিতে পারলে তিনি আর কিছুই চান না।

এদিকে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা কিন্তু তাঁর পেছনে লেগে গেলেন নাছোড়-বান্দার মত। অবশেষে ডাঃ ক্লিনার আইনস্টাইনকে রাজী করালেন অন্তত আংশিক সময়ের জন্য বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে। তার ফলে তিনি প্যাটেণ্ট অফিসের চাকরিতে বহাল থাকতে পারবেন, অধিকন্তু জুরিখে অধ্যাপক পদের জন্য তাঁর যোগ্যতা বাড়বে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে কিন্তু অধ্যাপনার কাজ তেমন লোভনীয় মনে হল না। একটা কিছু নতুন আবিষ্কারের দিকেই ছিল তার বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু তা না করে তাঁকে কিনা বক্তৃতা দিতে হতো তাপ সম্বন্ধে। মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। যা'হোক, তাঁর ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা দিত শুধু দু'জন ছাত্র। তাদের একজন ছিল টেলিগ্রাফ বিভাগের একজন যুবক কর্মচারী। তিনি পদার্থবিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন নিজের চেষ্টা ও যত্নে। অপর জন আইনস্টাইনের পুরানো বন্ধু বেসো। এই দুজন ছাত্র নিয়েই আইনস্টাইনের ক্লাস এবং এরই দৌলতে আইনস্টাইন আজ সহকারী অধ্যাপক।

আইনস্টাইন তাঁর ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন কালেভদ্রে। তিনি শুধু কথা বলার ভেতর দিয়ে দুই ছাত্রবন্ধুকে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতেন। একদিন ক্লাসে এলে দু'জনের জায়গায় তিনি পেলেন তিনজন শ্রোতা। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ক্লিনার স্বয়ং। কিন্তু সেজন্য তরুণ অধ্যাপকের ভেতর কোন চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি আগের মতই শান্ত ভাবে কথা বলার ভঙ্গিতে বরং কিছুটা অসতর্কভাবে বক্তব্য বলে গেলেন।

ডঃ ক্লিনার কিন্তু হতাশ হয়ে পড়লেন। ভবিষ্যতে যিনি অধ্যাপক হবেন তাঁর পড়ানোর ধরন এ-রকম হতে পারে না। এতে না আছে

পদমর্যাদা, না আছে শালীনতা। তিনি পরে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ করলেন।

তিনি বললেন, "আমি বলতে বাধ্য যে, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের বক্তৃতা বলতে যা আশা করা যায়, আপনার বক্তৃতা ঠিক তেমন নয়। আন্তরিকতার অভাব রয়েছে মনে হয়----শুধু দু'জন ছাত্র। যদি আপনি আরেকটু বেশী-----

আইনস্টাইন তাঁকে থামিয়ে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, অধ্যাপক ক্লিনার। এসব কাজের উপযোগী আমি নই। আমি অধ্যাপক হতে চাই না। আমি বলতে চাই, আপনি অপর কাউকে বেছে নিন।" আইনস্টাইন যে রাগ করে একথা বললেন তা নয়, সত্যিই তিনি প্যাটেন্ট অফিসেই থাকতে চান।

ডঃ ক্লিনার বিরক্তি বোধ করলেন। জুরিখে গিয়ে তিনি সবকিছু বললেন। সহকারী অধ্যাপকের পদে একজন লোক নেওয়া দরকার। এ পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন ভিয়েনার ডঃ ফ্রেডারিক এ্যাডলার। কিন্তু ডঃ এ্যাডলার তখন এ কথা শুনেই লিখে পাঠালেন, "আমাকে এপদ দেবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আইনস্টাইনকে যদি এপদের জন্য কোন রকমে পাওয়া যায় তবে তাঁর মত যোগ্য লোকের সঙ্গে আমি প্রতিযোগিতা করতে রাজী নই।"

আইনস্টাইনকে যখন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ দেবার প্রস্তাব হল তখনও তাঁর বয়স কুড়ির কোঠা ছাড়ায় নি। অথচ বেশ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে এ পদ কেউ পায় না।

আট

এতদিন নিজের নানা অক্ষমতার কথাই আইনস্টাইনকে বলতে হয়েছে সবার কাছে। এবার নতুন চাকরি পেয়ে প্রথম সুযোগেই তিনি খুশী মনে মাকে তামাশা করে লিখলেন, "মা, এতোদিন পরে তোমার বোকা ছেলে একজন অধ্যাপক হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ অধ্যাপক—ভেবে দেখো সহজ ব্যাপার নয়।"

আইনস্টাইন এ ব্যাপারে যে মনে মনে বেশ গর্ববোধ করছিলেন তা নয়, তাঁর একমাত্র খুশীর ব্যাপার হল, এখন থেকে তিনি সবটা সময় ব্যয় করতে পারবেন পদার্থবিদ্যার কাজে। একাজ তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সব। তবু এতদিন একাজ তাঁকে করতে হয়েছে খেয়াল খুশী মত অবসরের কাজের মত। যাঁরা তাঁর কাজের গুরুত্ব বোঝেন, আগ্রহ প্রকাশ করেন, এখন থেকে তাঁদের সঙ্গে করবার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। সে সুযোগের কথাই এখন তাঁর সারা মন ছেয়ে আছে।

মিলেভাও এ ব্যাপারে মনে মনে বেশ খুশী। অবশেষে তারা যে জুরিখে ফিরে যেতে পারবে এতেই সে খুশী। বার্নে এসে সে কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তার আশা, ছাত্রজীবন যে শহরে কেটেছে সেখানে যেতে পারলেই দিনগুলি আনন্দে কাটবে।

বেশী দিন হয়নি তাঁরা এখানে ঘরকন্না শুরু করেছিলেন। এরই ভেতর আবার নতুন জীবন শুরু করতে হল নতুনভাবে। অধ্যাপক হবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব যেমন বেড়ে গেছে তেমনি বেড়েছে সামাজিক কর্তব্য। বার্নে থাকতে তাঁরা যেমন ছোট্ট একটি কামরা নিয়ে ছিলেন এখন আর তা করলে চলে না। এবার বড় দেখে একটি ঘর ভাড়া করতে হল। সংসারের খরচও অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু প্যাটেন্ট অফিসের তুলনায় আইনস্টাইনের মাইনে বাড়েনি মোটেই। কাজেই সংসার চালানোর চিন্তা বাড়লো বই কমল না।

আইনস্টাইন কিন্তু খাওয়ার বা সামাজিকতা রক্ষা করে চলার চিন্তাকে মোটেই আমল দেন না। তাঁর মনে সে-সব চিন্তার ঠাঁই আদৌ নেই। যে গভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় তাঁর মন মগ্ন তার কাছে আর সবকিছু অতি তুচ্ছ। ছেলেবেলায় তিনি যা জানতে চাইতেন তা' জানতে না পারার দুঃখ আজ আর তাঁর নেই। আজ তাঁর মনের ভেতরে এসেছে একটা সন্তুষ্টির ভাব, নিজের প্রতি একটা দৃঢ় বিশ্বাস। মনের এই সন্তুষ্টিই তাঁকে নিত্যকার অভাব-অভিযোগের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

মনোভাব যাঁর এরকম সেই আইনস্টাইনের পক্ষে বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে গুরুত্ব দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। যদিও অপরের পক্ষে সত্যি তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কাউকে পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখলে আইনস্টাইন খুব আমোদ পেতেন। মিলেভা প্রায়ই

তাঁকে বলত একটা ভাল স্যুট কিনতে। আইনস্টাইন তাই শুনে শুধু হাসতেন আর বলতেন, "মাংসের চেয়ে মাংসের থলেটার দাম যদি বেশী হয় তা' হলে হাস্যকর ব্যাপার হয় না কি? না গো, না, চমৎকার চাকচিক্যময় পোশাকে আমার কাজের মর্যাদা বাড়াবে না। আমার এই পুরানো টুইডের পোশাকই আরামদায়ক।"

যতই দিন যেতে লাগল, আইনস্টাইন ততই বুঝতে পারলেন যে সরকারী অধ্যাপকের কাজটা যত সহজ তিনি মনে করেছিলেন তা তত সহজ নয়। ক্লাসে বক্তৃতা দেবার জন্য তৈরি হতে তাঁকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। তার উপর ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয় এবং অফিসের কাজও করতে হয়। তাঁর গবেষণার জন্য যে সময় তিনি পেতেন তা ক্রমশঃই যেন কমে আসছে। নিরিবিলি থাকবার সুযোগও আর তেমন নেই। অথচ তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি ছাপা হবার পর আরও কত নতুন চিন্তা নতুন মতবাদ তাঁর মনের কোণে গড়ে উঠেছে।

তখনও পর্যন্ত 'আপেক্ষিকবাদ' সবেমাত্র একটা ঘরের কাঠামোর মত---সাজেগোজে পুরোপুরি ঘর হতে অনেক বাকি। তাঁর মতবাদের মোটামুটি একটা ধারণা মাত্র দেওয়া হয়েছে; আসল জিনিসটি দাঁড় করাতে গিয়ে এখনও তাঁকে অনেক কাটখড় পোড়াতে হবে। বার্নে অতীতের দিনগুলির কথা তাঁর মনে পড়ে। প্যাটেন্ট অফিসের কাজ করেও তখন নিজের কাজে মনোযোগ দেবার অবসর ছিল অফুরন্ত। সবচেয়ে উপরতলার সেই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে রাত্রে তিনি চিন্তা করতেন---বাধা দেবার কেউ ছিল না।

আইনস্টাইনের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল অতি সাধারণ। তিনি শুধু চাইতেন একটু অবসর, নিরিবিলি চিন্তা করবার একটু সুযোগ। নিজে নীরবে কাজ করলেও তাঁর অবদান কিন্তু বেশী দিন চাপা রইল না। তাঁর খ্যাতি দাবানলের মতই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইউরোপের সমস্ত দিক থেকে আসতে লাগল শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল বক্তৃতা দেবার জন্য। তিনি সে-সব নিমন্ত্রণের দু'চারটি মাত্র গ্রহণ করতেন। কারণ, এসব ব্যাপারে সময় নষ্ট করে নিজের কাজে ব্যাঘাত জন্মাতে তাঁর মন চাইত না।

যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য পৃথিবীর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের অনেকে হাজির হতেন। জুরিখের এই নতুন

অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনবার জন্য নিজের গবেষণার কাজ ফেলে প্যারিসে ছুটে এলেন বৈজ্ঞানিক মাদাম মেরী কুরী। আইনস্টাইনের ব্রুসেল্‌সে বক্তৃতা দেবার সময় এলেন তৎকালীন পদার্থবিদ্‌দের অগ্রগণ্য অধ্যাপক ম্যাক্‌স প্লাঙ্ক। বক্তৃতার পরে অধ্যাপক প্লাঙ্ক ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দীর্ঘ আলোচনায় মগ্ন হলেন। একদিকে জার্মানীর দীর্ঘকায় অভিজাত শ্রেণীর অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌ প্লাঙ্ক অপর দিকে একমাথা এলোমেলো চুল নিয়ে টুইডের ছিন্ন পোশাক পরিহিত তরুণ অধ্যাপক আইনস্টাইন। তবু দু'জনের আলোচনায় আগ্রহ বা আন্তরিকতার অভাব দেখা গেল না। মনে হল, চিন্তার জগতে তাঁরা যেন দু'ভাই।

এভাবেই হল আইনস্টাইনের জগৎ জোড়া খ্যাতির সূত্রপাত। তারপর খ্যাতি তাঁকে অনুসরণ করেছে তার বাকি সারাজীবন। —শুধু মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানবিদের কাছেই তা পরিচিত। তাঁরাই শুধু তাঁকে খুঁজে বেড়াতেন অত্যন্ত আগ্রহভরে। পৃথিবীর বাকি সবাইর কাছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তখনও অপরিচিত।

জুরিখের চাকরিতে যোগদানের পর খুব বেশী দিন কাটে নি। এমন সময় এল প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরি অধ্যাপকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব। বিনা দ্বিধায় আইনস্টাইন এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রস্তাবিত চাকরিতে অবসর পাওয়া যাবে প্রচুর, তা'ছাড়া বেতন অনেক বেশী। অধিক বেতন পেলেই তাঁর সংসারে আনবে সচ্ছলতা। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপের অন্যতম পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে রয়েছেন এমন সব ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে যাঁদের পাণ্ডিত্য অগাধ। পৃথিবীর সকল দিক থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জড়ো হয় এখানে।

চাকরি নিয়ে জুরিখে আসার চেয়ে প্রাগে যাবার ব্যাপারটা অনেক সহজ। আইনস্টাইন-পরিবার এখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন অনেকখানি। কিসের পরে কি করতে হবে তাও তাঁরা জানেন। তবু প্রাগে আসতেই আইনস্টাইন শুনতে পেলেন প্রচলিত একটি রীতির কথা। সেখানে নবাগত সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অধ্যাপকের বাড়ী গিয়ে দেখা করে আসতে হয়। জীবনে যিনি ধরাবাঁধা নিয়ম বা আদব-কায়দার ধার ধারেন নি, তাঁর কাছে এ রীতি সত্যিই অপ্রীতিকর। তবু বিভিন্ন ঠিকানার একটা তালিকা তৈরি করে প্রতি সপ্তাহের একটি বিকাল তিনি একাজে ব্যয় করতে লাগলেন।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, "এ বিরক্তিকর কাজটা করতে গিয়ে অন্তত একটা লাভ আমার হবে, এ সুন্দর শহরের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখে নেওয়া যাবে।" প্রথম দেখা করবার জন্য তিনি ঠিক করলেন লোকদের এমন সব বাড়ী যে গুলি কোন-কোন ঐতিহাসিক জায়গায় অবস্থিত। এমনি করে তিনি সুদৃশ্য প্রাচীন শহরের প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি শুধু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দ্রষ্টব্য সবই যখন দেখা হয়ে গেল, তখন সহসা একদিন তিনি দেখা করার পালা শেষ করে ফেললেন।

এর ফলে যে-সব অধ্যাপকরা বাদ পড়লেন তাঁরা স্বভাবতই বিস্মিত হলেন, কেউ কেউ একটু ক্ষুণ্ণও হলেন। তাঁরা জানতেন না তাঁদের বাসস্থান অখ্যাত জায়গায় বলেই অধ্যাপক আইনস্টাইন দেখা করতে আসেন নি। তা'ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কারণ নেই। তবু আইনস্টাইনকে একদিন নিজেদের বাড়ীতে না পেয়ে তাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন। এরই ভেতর আইনস্টাইন কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছেন তা'ছাড়া তিনি ছিলেন একটু অসাধারণ প্রকৃতির লোক। এজন্য সবাই তাঁকে দেখতে চাইত এবং নিজের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে পেতে চাইত।

বহু রকম বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও আইনস্টাইন তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশ্য সে জন্য শিক্ষক হিসাবে তাঁর চিন্তার জগতে কোন ঘড়ির অস্তিত্ব ছিল না। চিন্তা করতে শুরু করলে তিনি কখনও সময়ের দিকে তাকাতেন না। তাঁর সৃজনশীল মন পারিপার্শ্বিক সবকিছু বাদ দিয়ে যে-কোন অবস্থায় চিন্তায় মগ্ন হতে পারত। পার্কে পায়চারী করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেস্কের পাশে বসে অথবা ক্রন্দনরত নিজের ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে তিনি মনের কাজ চালিযে যেতেন অনায়াসে। তাঁর মনের একাগ্রতা ছিল অসাধারণ।

প্রথমে ছাত্ররা তাঁকে কোন রকম প্রশ্ন করতে ইতস্তত করত। ছাত্ররা তাঁকে ভক্তি করত, ভয়ও করত। অধ্যাপককে দেখে তাদের মনে হত তিনি যেনো বাহ্যিক সবকিছু ভুলে কোন চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করছেন।

কিন্তু ছাত্রদের ডেকে তিনি বলতেন, "যখন তোমাদের যা খুশি আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমার কাজগুলি সব এইখানে।" এই বলে একটু হেসে তিনি আঙুল দিয়ে নিজের মাথা দেখাতেন, এবং

বলতেন "তোমাদের কাজ হয়ে গেলেই যে-কোন মুহূর্তে আবার আমি ফিরে যেতে পারি এখানে।"

ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনকে নেবার প্রস্তাব আসতে লাগল কিন্তু একটার পর একটা চাকরি পরিবর্তন করা তিনি পছন্দ করতেন না। রাজনৈতিক অবস্থাও তাঁকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তিনি জানতেন ইউরোপে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে গিয়ে তিনি কিছুতেই স্বাধীনভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন না। বলকানে তখন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হচ্ছিল তাই একদিন পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে পরিণত হবে বলে ভয় হচ্ছিল। জার্মানীর নতুন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন একজন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং নৌসেনা সংগ্রহ করে উপনিবেশগুলি দাবি করতে লাগলেন। নতুন জার্মানীর এই যুদ্ধংদেহী ভাব দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মধ্য-ইউরোপের অশান্তিতে প্রাগ প্রভাবিত হল। আইনস্টাইন অশান্তির আশঙ্কা করতে লাগলেন। তিনি যে কোন প্রকার বল প্রয়োগকেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। তা'ছাড়া বলপ্রয়োগ না করে মানুষ কেনো আপসে নিজেদের ঝগড়া মিটিয়ে নিতে পাবে না তাই ভেবে তিনি দুঃখিত্র হতেন।

অতঃপর তাঁর সেই পুরানো স্কুল ফেডারেল পলিটেকনিক আইন-স্টাইনকে পুরোপুরি অধ্যাপকের পদে নেবার প্রস্তাব পাঠাল। মিলেভার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর আলোচনা হল। তিনি বললেন, "এ প্রস্তাব বিভ্রান্তিকর। আবার সেই জুরিখে ফিরে যাবার কোন অর্থ হয় না। এখানেই নিজের কাজ নিয়ে আমি বেশ আছি।"

মিলেভার চোখের দৃষ্টি কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "এ প্রস্তাবটা তুমি পেয়েছো বলে আমি কিন্তু ভারি খুশী হয়েছি। পুরানো এই নোংরা শহর আমি ছেড়ে যেতেই চাই।"

"কিন্তু এখানে তুমি তো সুখেই ছিলে। কোন কিছুর অভাবই তো তোমার ছিল না।"

"এখানে থেকে কোনোদিনই আমি সুখী হবো না। জুরিখ ছাড়া কোথাও আমি শান্তি পাবো না, অন্য কোনো শহরেই না।"

আইনস্টাইন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, "আমরা তো সবে-মাত্র এখানে এসে ঠিকঠাক হয়ে বসেছি----।"

"আমি জুরিখে ফিরে যেতে চাই" এই বলে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে মিলেভা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা আইনস্টাইন গ্রীষ্মের পরীক্ষার পরেই চলে যাবেন ঠিক করলেন এবং প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে কথাটা জানিয়েও রাখলেন। তারপর আবার সেই জুরিখ যাত্রা। আইনস্টাইন পরিবারের সবাই—অ্যালবার্ট, মিলেভা, পুত্র অ্যালবার্ট ও এডওয়ার্ড একদিন মোটঘাট বেঁধে আবার রওয়ানা হলেন জুরিখ।

যাবার সময় আপন ভোলা আইনস্টাইন ভাবতে পারেননি যে স্টেট অফিসে তিনি ছোটখাটো একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে রেখে যাচ্ছেন। যে-কোনো কর্মচারীকে দেশ ছেড়ে যেতে হলে জটিল ধরনের একটা ফর্ম পূরণ করতে হ'ত। আইনস্টাইন নিয়মকানুনের ধার ধারতেন না। কাজেই সেই ফরম পূরণ না করেই তিনি প্রাগ ত্যাগ করলেন। তারপর, বেশ কয়েক বছর কেটে গেলে জগতের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসাবে তিনি যখন একবার প্রাগে এলেন বক্তৃতা দিতে তখন তাঁর একজন সহকর্মী হাস্‌তে হাস্‌তে সেই অসমাপ্ত ফাইলটি তাঁকে দেখালেন। তার উপর লেখা রয়েছে—"আইনস্টাইন—অসমাপ্ত।"

আইনস্টাইনও হাসলেন। হেসে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার ওটা আমি নিশ্চয়ই ঠিক করে দেবো। যে কেরানীর হাতের ফাইল এটা তার উৎকণ্ঠা কমাতেই হবে এখখুনি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন স্টেট অফিসে সেই ফরমটা পূরণ করতে আর এদিকে নামকরা সব লোক তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলেন। স্টেট অফিসে গিয়ে আইনস্টাইন ফরমটি পূরণ করে দিলেন। তারপর কেরানী যখন ফাইলের গায়ে লিখল —"আইনস্টাইন সমাপ্ত"—তাই দেখে তিনি খুশী মনে ফিরে এলেন।

আইনস্টাইন তাঁর পুরানো স্কুলে ফিরে এলেন একজন সদস্য হিসাবে। সেই আগের দিনের অধ্যাপকরা এখনও রয়েছেন। তাঁরাই একদিন আইনস্টাইনকে বলতেন, হাবা, অমনোযোগী এবং কোনো কাজের অনুপযোগী। আর আজ আইনস্টাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে তাঁরা শ্রদ্ধা জানান।

এসব তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে আইনস্টাইনের নিজের কিন্তু কোনো খেয়াল নেই। তিনি মগ্ন হয়ে থাকেন তাঁর আপেক্ষিকবাদের চিন্তায়। প্রাগে থাকতে তিনি এ সম্বন্ধে আরও প্রবন্ধ লিখেছেন। সে সব প্রবন্ধ

এ বিষয়ে আরও আগ্রহান্বিত করে তুলেছে বৈজ্ঞানিকদের। কিন্তু তা'হলেও আরও অনেক কিছু করতে বাকি রয়েছে এখনও। আইনস্টাইনের আজব মতবাদ পদার্থবিদ্‌দের বিচলিত করে তুলল কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর মতবাদ নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন।

জুরিখে একটা লাভ হল—অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেলেন। মারসেল গ্রসম্যান তখনও সেখানে ছিলেন। একত্র কাজ করবার সুযোগ পেয়ে দুই পুরানো বন্ধুর মন কানায় কানায় ভরে উঠল খুশীতে। গ্রসম্যানের গণিতের জ্ঞান আইনস্টাইনের অনেকখানি পরিশ্রম লাঘব করে দিল। কাজ চলতে লাগল অবিরাম গতিতে। তার ফলে জুরিখে থাকতে আইনস্টাইনের আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

কিন্তু জুরিখে বেশীদিন থাকা আইনস্টাইনের পক্ষে সম্ভব হল না। সবেমাত্র এক বৎসর জুরিখে কেটেছে এমন সময় বার্লিনের প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর সদস্য পদ গ্রহণের এক আমন্ত্রণ এল আইনস্টাইনের কাছে। এ আমন্ত্রণ সত্যিই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এরপর অধ্যাপনার কাজও থাকবে না, অন্য কোন ধরাবাঁধা কাজও থাকবে না, কাজেই সবটা সময় তিনি ব্যয় করতে পারবেন গবেষণার কাজে। এ্যাকাডেমীর ডিরেক্‌টর ম্যাকস্‌ প্ল্যাঙ্ক এবং আরো সব খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ হবেন সেখানে তাঁর সহকর্মী।

বাস্তবিক পক্ষে আইনস্টাইন জুরিখ ত্যাগ করতে চান্‌নি। তিনি সেখানে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর মনের কোণে ছিল শৈশবের স্মৃতি। জার্মানীতে ফিরে যেতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজের চিন্তাই সব কিছুর আগে। সব কিছু ছেড়ে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করবার এই তো অমূল্য সুযোগ। কাজেই, শেষ পর্যন্ত তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

একটি মাত্র অনুরোধ তাঁর ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। সেটা হল—তাঁকে সুইস নাগরিক হয়ে থাকবার অনুমতি দিতে হবে। আইনস্টাইনকে বার্লিনে ফিরে পাবার আগ্রহ তাঁদের এত প্রবল ছিল যে, অনায়াসে তাঁরা এ অনুরোধ রক্ষা করলেন। তার ফলে ভিন্ন দেশের এক নাগরিক হলেন প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমীর সদস্য। গর্বিত জার্মানদের পক্ষে প্রচলিত নিয়মের অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। তা' হোক, যে-কোন উপায়ে আইনস্টাইনকে তাঁদের চাই।

কিন্তু বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এল আরেক দিক থেকে। স্বামীর এ নতুন সৌভাগ্যের কথা শুনেও মিলেভা বলে ফেলল, "আমি কখ্খনো জুরিখ ছেড়ে যাবো না।"

আইনস্টাইন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, "তুমি বুঝে দেখো—তুমি নিজেও তো একজন বিজ্ঞানী। এটা আমার পক্ষে কতো বড় সুযোগ তুমি জানো।"

কিন্তু আইনস্টাইনের সঙ্গে মিলেভার মতের এ অমিল শুরু হয়েছে অনেক আগেই। স্বামীর কাজে বিন্দুমাত্র আগ্রহও তাঁর নেই। সব সময়েই তাঁর ভেতর ছিল একটা অসন্তুষ্টির ভাব।

সময় ঘনিয়ে এল। আইনস্টাইন অবশেষে একাই যাত্রা করলেন নতুন চাকরিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে। দু'জনেই তাঁরা বুঝেছিলেন যে মিলেভা কোন দিনই বার্লিনে আসবে না।

নয়

তখন ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকাল। আন্টার ডেল লিনডেন বীথিকার দু'পাশে গাছের মাথায় নতুন পাতার সমাবোহ। এই বীথি-কার পারেই স্টেট্ লাইব্রেরীর বিশাল অট্টালিকা। অট্টালিকার সামনের অংশ দখল করেছে প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জানালা পথে চেয়েছিলেন রাস্তার অপর পাশে রৌদ্রালোকিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দিকে।

তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন এখানে এসে তাই পেয়েছেন। বেশী দিন হয়নি তিনি এসেছেন কিন্তু এরই ভেতর সবকিছু ঠিকঠাক করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন এখন তাঁর খুবই কম। জীবনে এই প্রথম তিনি সবটা সময় ব্যয় করবার সুযোগ পেয়েছেন নিজের কাজের চিন্তায়।

মিলেভা ও তাঁর ছেলেরা সঙ্গে থাকলে অবশ্য দিন কাটত অন্য-ভাবে। কিন্তু তাঁর নিজের প্রতি একাগ্রতা ছিল এত বেশী যে অপর কোন কিছুর ভাবনাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না। অনেক সময় তিনি একা একা বোধ করতেন কিন্তু একা থাকা ছিল তাঁর জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ছাত্রজীবনে সর্বদাই তিনি সবাইকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবেও আজ তাঁকে একাই চিন্তার বিশাল রাজ্যে বিচরণ করতে হচ্ছে। এবং তার ফলে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা হাল্‌কা হয়ে উঠেছে।

আগের চেয়ে এখন আইনস্টাইন নিজের সাজগোজ সম্বন্ধে আরও বেশী অমনোযোগী। নেকটাই, টুপি, মাথার চুল ছাঁটাই---এসব ছিল তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। নিত্যকার এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারত না। যে সব ব্যাপারে অন্য যে কেউ ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ত সে সব ব্যাপার তিনি উড়িয়ে দিতেন তার মিষ্টি মুচকি হাসি বা প্রাণখোলা অট্টহাসি দিয়ে। বার্লিনে এসে তাঁর মন বিচরণ করছিল সর্বোচ্চ স্তরে। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, অদূরেই রয়েছে তাঁর আপেক্ষিকবাদের পরিসমাপ্তি।

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে মিলেভা ও আইনস্টাইনের মধ্যে এখন পাকাপাকি ভাবেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আইনস্টাইনের পিতার মৃত্যু হয়েছে। ভগ্নী মায়ার বিয়ে হয়েছে উইনটেলার পরিবারে। আইনস্টাইনের মা এখন মায়ার সঙ্গেই থাকেন। তিনি আইনস্টাইনকে চিঠি লিখ্‌লেন, "এখন তুমি বার্লিনে রয়েছো। কাজেই, হ্যাবার ল্যাণ্ডেস্ট্রেসে গিয়ে অবশ্য তোমার কাকা রুডির সঙ্গে দেখা করবে।"

ভাই-পো আইনস্টাইন বার্লিনে এসেছেন দেখে মিঃ রুডিও বেজায় খুশী। এ উপলক্ষে তিনি একদিন এক ডিনার পার্টির আয়োজন করে ফেললেন। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা ধারে-কাছে ছিলেন সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হল সেই পার্টিতে। আইনস্টাইনকে তাঁরা যখন দেখেছেন তখন তিনি ছিলেন উদাসীন এক বালক। আজ তাঁদের সেই আত্মীয়ই ৩৪ বৎসর বয়সে সায়েন্স এ্যাকাডেমীতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন পৃথিবীর বিখ্যাত সব বিজ্ঞানবিদ্‌দের পাশে। তাঁর এ গৌরবে আজ সবাই তাঁরা গৌরবান্বিত।

আইনস্টাইনের চাচাতো বোন এলসাও ছিল তাঁদের ভেতর। সে এখন বিধবা। ছোট্ট দু'টি মেয়ে নিয়ে পিতার গৃহেই সে বাস করে।

মিউনিকে চড়ুইভাতি করবার সময়ে যে ছিল আনন্দময়ী কিশোরী আজ সে পরিপূর্ণ নারী---মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি।

এদের সঙ্গে একটি বিকাল বেশ আনন্দে কাটল। আইনস্টাইনের প্রিয় সব খাদ্যেরই ব্যবস্থা হয়েছিল সেদিন। বিকেলে সবশেষে দেওয়া হল কফি আর কফিকেক্।

কফিকেক্ খেতে খেতে আইনস্টাইন বললেন,"চমৎকার লাগছে এ কেক্---ঠিক আমার মা যেমন তৈরি করতেন।"

এল্সা তাঁর কথায় হেসে জবাব দিল, "সে রকম লাগাই উচিত। কারণ, এ কেক তৈরির কায়দা আমি শিখেছিলাম পলিন কাকীর কাছ থেকেই।"

আইনস্টাইন তাঁর বেহালাটি সঙ্গে আন্তে ভোলেননি। তিনি বেহালা বাজালেন, পিয়ানো বাজালো তাঁর অপর এক বোন। সুরের জাল সৃষ্টি হল দু'য়ের চেষ্টায়।

বিদায়ের সময় আইনস্টাইনকে প্রবেশদ্বার অবধি এগিয়ে দিতে এল এলসা। বলল, "তোমাকে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দিচ্ছি। অনেক রাত হয়েছে, তোমাকে যেতে হবে অনেক দূর।"

হেসে আইনস্টাইন নিজের পা দু'খানা দেখিয়ে বললেন, "এই পা দু'খানার চেয়ে ভাল গাড়ি হতেই পারে না। চমৎকার রাত্রি, যেতে যেতে অনেক কিছু চিন্তা করবার সুযোগ পাব। গুড নাইট্!"

"গুডনাইট, অ্যালবার্টল! শীগ্গীরই একদিন এসো আবার।"

অ্যালবার্টল। আইনস্টাইনের মনে পড়ল, অনেকদিন এ নামে তাকে কেউ ডাকেনি। আঁধার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি সে সব চিন্তাই করছিলেন।

তারপর থেকে প্রায়ই তিনি এখানে আসতে লাগলেন। পরে স্থির হ'ল, অতঃপর এখানেই তিনি প্রতিদিন আহার করবেন। এ ব্যবস্থার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আইনস্টাইনের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হল। কারণ, খাবার চিন্তা তিনি খুব কমই করতেন এবং খেলেও যে-কোনো একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সামান্য কিছু খেয়ে নিতেন। অনেক সময় খাবারের কথা কেউ মনে করিয়ে না দিলে না-খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।

আইনস্টাইন যখন কোনো সভা সমিতিতে বা কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হতেন তখন যাতে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে

কোনো ত্রুটি না-থাকে সেদিকে এলসা সতর্ক দৃষ্টি রাখত। কিন্তু আইনস্টাইনের স্বভাবই ছিল, ঢিলেঢালা জামাকাপড় আর ময়লা জুতা পরে সর্বত্র যাওয়া। কিন্তু অহঙ্কারী জার্মানরা এজন্য তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত, তারা পছন্দ করত জাঁকজমক।

এসব দিকে আইনস্টাইনের আদৌ কোন লক্ষ্য ছিল না। পথের ঝাড়ুদারনী আর মেয়র তাঁর কাছে সমান ব্যবহারই পেত। অবশ্য অন্য কেউ যদি বাহ্যিক চাকচিক্য বা আদবকায়দায় সময় ব্যয় করতে চাইত তাতে তিনি আপত্তি করতেন না। কিন্তু তিনি নিজের জন্য কখখনো এসবের প্রয়োজন বোধ করতেন না।

তাঁর সমস্ত কাজের মূলেই ছিল তার গবেষণা। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি তার আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বার্নে থাকতে তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে বিজ্ঞান জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবার তার চেয়েও বেশী হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা' হল না, কারণ ঠিক এ সময়েই জার্মানরা তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। প্রথম মহাসমর তখন শুরু হয়ে গেছে পূর্ণোদ্যমে।

যে আইনস্টাইন সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন তাকেই বাস করতে হচ্ছে যুদ্ধে লিপ্ত একটি দেশের রাজধানী-শহরে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। অবশেষে বাইরের সবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন আরও একাগ্রভাবে। এ সময়ে একদিন বিনা আড়ম্বরে আইনস্টাইনের বিয়ে হয়ে গেল এলসার সঙ্গে। বিয়ের পর উভয়ে তাঁরা মেয়ে দু'টি নিয়ে এখানেই বাস করতে লাগলেন।

এ ভয়াবহ মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখে দুনিয়ার সর্বত্রই লোকেরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। নেতৃস্থানীয় জার্মানদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা চাইছিলেন, জার্মানরা যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ, দুনিয়াকে তাই দেখাতে। দেশের সেরা শিল্পী আর বৈজ্ঞানিক-দের একত্র করে তাঁরা একটা বিবৃতি দিলেন। জার্মানীর সামরিক কার্যকলাপ সমর্থন ক'রে বিবৃতিতে জার্মানীকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিরানব্বই জন খ্যাতনামা ব্যক্তি সে বিবৃতিতে দস্তখত দিলেন। কিন্তু আইনস্টাইন এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করছিলেন

না। তিনি বললেন, "এখন দোষ ঢাকবার প্রচেষ্টা অনর্থক। বরং তোমাদের শক্তি দুনিয়ার শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যয় করো।"

এ ব্যাপারে হোমরাচোমরা সবাই বিস্ময় বোধ করলেন। এতদিন তাঁরা আইনস্টাইনকে দেখেছেন দেশের বিশিষ্ট সম্পদ রূপে, জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রয়েছেন তাঁদের দলে, এতদিন এই তাঁরা মনে করেছেন। কিন্তু আইনস্টাইন ভাবতেন অন্যভাবে। যুদ্ধ-বিগ্রহকে তিনি মনে করতেন অপ্রয়োজনীয় ও অমানুষিক ব্যাপার। তাই তিনি বলতেন, "আমাকে টুকরা টুকরা করে ফেললেও যুদ্ধে লিপ্ত করাতে পারবে না।"

জার্মানরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করল। তিনটি বিশেষ কারণে এখন আইনস্টাইন তাদের অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রথমত তিনি তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন করতেন না, দ্বিতীয়ত তিনি একজন বিদেশী এবং তৃতীয়ত তিনি ছিলেন জাতে ইহুদী। তারা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না কিন্তু আইনত তিনি জার্মান না বলেই তা' সম্ভব হয়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, এতদিন অবধি সুইস্ নাগরিকত্ব বজায় রেখে তিনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন।

আইনস্টাইন সুইস ছিলেন বলে সুইস নাগরিকরা কিন্তু সবাই খুব খুশী ছিল। তাই যুদ্ধের সময় তারা তাঁকে ভুলে যায়নি বরং নিয়মিত তারা খাবারের পুঁটলী পাঠিয়েছে আইনস্টাইনকে এবং এলসা সে জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ যুদ্ধের সময় বার্লিনে খাদ্য যে শুধু দুষ্প্রাপ্য ছিল তা নয়, কদর্যও ছিল। এলসা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, আইনস্টাইনের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ করতে। কারণ, জুরিখে বেকার অবস্থায় থাকা কালে আইনস্টাইন উদরাময়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

দশ

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ছিল শুধু সময় ও শূন্যতা, বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে। আইনস্টাইনের এ মতবাদ এত জটিল যে কেবল মাত্র অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরাই তা বুঝতে পারবেন বলে আশা করতেন। এমন কি যে সব পদার্থবিদ এসব নিয়েই গবেষণা করতেন তাঁদের

ভেতরেও অনেকে এ মতবাদের অংশবিশেষ বুঝতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়তেন। এ মতবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, হাতে-নাতে প্রমাণ পাবার আগে অনেক বিজ্ঞানীই তা বিশ্বাস করতে চান নি। তাঁরা দেখছিলেন, আইনস্টাইনের মতবাদ মেনে নিতে হ'লে ইতিপূর্বে স্বীকৃত বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক ধারণাই পালটাতে হয়।

আইনস্টাইনের মতবাদ যে ঠিক, হাতেনাতে তা' প্রমাণ করা অসম্ভব কিছু ছিল না। এ মতবাদ সত্যি হলে, সূর্যের দিকে যে-সব তারা দেখা যায়, মনে হবে সেগুলো সামান্য স্থানচ্যুত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতির্বিদরা সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় সে তারা দেখবেন কি করে? এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল, সূর্যের পূর্ণ গ্রাস না-হওয়া অবধি অপেক্ষা করে থাকা। সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদ আসে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। মাঝখানে এসে সূর্যকে আড়াল করে রাখে। তখন জ্বলন্ত সূর্যের তীব্র আলো আর চোখে পড়ে না। তখনকার আঁধার আকাশে সূর্যের আশপাশে ছড়ানো তারা চোখে পড়ে সহজে।

প্রথম মহাসমরের সমাপ্তি ঘটল ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে। তার পরের বছর মার্চ মাসে সূর্যের পূর্ণগ্রাস হবার কথা। রয়েল সোসাইটি অব ইংল্যাণ্ড হল পৃথিবীর সব সেরা বিজ্ঞানীদের এক সংস্থা। তাঁরা স্থির করলেন, দু'টি অভিযাত্রীদল পাঠাবেন আফ্রিকা ও ব্রাজিলে। সেখান থেকেই সূর্য সবচেয়ে ভালভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। অভিযাত্রী জ্যোতির্বিদরা আলোকচিত্র গ্রহণের নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। গ্রহণ স্থায়ী হবে দু'মিনিট। এ দু'মিনিটকাল আকাশ মেঘশূন্য থাকলে তাঁরা ভালভাবেই সবকিছু দেখতে পাবেন।

এতসব কল্পনা-জল্পনার ব্যাপারে আইনস্টাইনের করণীয় কিছুই ছিল না। তিনি প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমীতে তখনও নিজের কাজ নিয়েই তন্ময়।

একদিন ভোরবেলা এলসা কিসের একটা প্যাকেট এনে আইন-স্টাইনের সামনে ডেস্কের উপর রাখলেন। রেখে বললেন, "এগুলো রয়েল সোসাইটির পাঠানো সূর্য গ্রহণের সব ফটো। এইমাত্র তাঁদের পাঠানো লোক এসে দিয়ে গেল এগুলো।"

এলসা প্যাকেটটা খুলতে লাগলেন। আইনস্টাইন বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এইতো?" একের পর এক বড় বড় ফটোগুলো তিনি দেখতে লাগলেন। এলসা দেখছিলেন তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে। তিনি

দেখছিলেন শুধু গোল একটা চাকতি, চারপাশে আলোর একটা আংটি, ফটোর পটভূমির সবটাই গাঢ় কাল। তাঁর কাছে এ ছবির কোন মূল্য নেই। তিনি অপেক্ষা করছিলেন স্বামী কি বলেন তাই শুনতে।

"চমৎকার, অদ্ভুত, সুন্দর!" ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন আইনস্টাইন।

"হ্যাঁ' সত্যিই চমৎকার।" তাঁর কথা সায় দিয়ে এলসা বলে উঠলেন "এবার তোমার প্রমাণ হাতে এসে গেল।"

আইনস্টাইন জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মুখ তুলে চাইলেন স্ত্রীর দিকে। চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রমাণ? প্রমাণ কি বলছ তুমি?"

"কেন, তোমার আপেক্ষিকবাদ যে ঠিক তারই প্রমাণ। কোনো কোনো বিজ্ঞানী যে আজো তোমার মত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এখন আর তা পারবেন না।"

দূরাগত ট্রেনের শব্দের মত গড় গড় করে এক রকম শব্দ হল তার স্বামীর কণ্ঠে। তারপরই তিনি উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লেন।

হতভম্ব এলসার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। তিনি থতমত খেয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু---কিন্তু তুমিই তো বললে চমৎকার। ---আমি ভাবলাম প্রমাণ পেয়ে তুমি খুব খুশী হয়েছো।"

"প্রমাণ! প্রমাণ!" আইনস্টাইন তখনও হাস্‌ছিলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বললেন, "না গো, না। আমি কখ্‌খনো প্রমাণ চাইনি। প্রমাণ চেয়েছেন তাঁরা।"

আইনস্টাইন নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বরাবরই ছিলেন স্থিরনিশ্চিত। কাজেই, রয়েল সোসাইটির সূর্যগ্রহণ অভিযান এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে তার মোটেই কোন আগ্রহ ছিল না। অভিযাত্রীদল যা দেখতে পাবেন আইনস্টাইন তা' আগে থেকেই জানতেন।

"চমৎকার!" তিনি আবার বিড় বিড় করতে লাগলেন। ফটো-গুলো যে চমৎকার হয়েছে তাই তিনি বলছিলেন। কালো আকাশের বুকে ক্ষুদ্রতম তারাটি যে আলোকচিত্রে ধরা পড়েছে, সে-সব আলোক-চিত্র যাঁরা তুলেছেন তাঁদের কাজের প্রশংসাই করছিলেন আইনস্টাইন।

জীবনের এ পর্যায়ে পৌঁছে আইনস্টাইন তাঁর সবচেয়ে বড় কাম্য-বস্তুটি হারিয়ে ফেললেন। সেই কাম্যবস্তু হল তাঁর নিরালা অবসর। তাঁর অমূল্য অবদান আজ শুধু বিজ্ঞানীদের গবেষণার ব্যাপার নয়।

আজ সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছেন তিনি। অসংখ্য ভাষায় আজ তার সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে দেশে দেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আসতে লাগল বিভিন্ন জায়গার বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলাসমিতি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে। সারাজীবনেও যে সব শিশুদের তিনি দেখেন নি তাদের নামকরণ হতে লাগল তাঁর নামে। তাঁর সম্মানে বিভিন্ন পদক ঘোষণা করা হল। রাস্তায় বের হলে স্বাক্ষর শিকারীরা এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। তাঁকে পথ চলতে দেয় না। একজন কারিগর তার নিজের তৈরি চুরুটের নামই রেখে ফেলল 'রিলেটিভিটি'।

আইনস্টাইনের নামে বস্তা বোঝাই চিঠিপত্র আসতে লাগল বাড়িতে। বেচারী এলসা তার ভেতর হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তার সাহায্যের দরকার হল সেগুলো বাছাই করতে, তার জবাব লিখতে। আইনস্টাইন কিন্তু এসব বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত। স্ত্রীকে তিনি বলতেন, "তুমি এসব নিয়ে ভেঙে পড়ো না। সাধারণ লোকদের এটা একটা সাময়িক খেয়াল বই কিছুই নয়। তিন মাস পরেই তারা আমাকে ভুলবে, সেই সঙ্গে ভুলবে আমার আপেক্ষিক মতবাদ। তখন আবার যে কে সেই হবে।" কিন্তু আইনস্টাইন যদিও ভুল করতেন কদাচিৎ, তবু তাঁর এ ধারণা ছিল ভুল।

যতই দিন যেতে লাগল এলসা ততই শিখতে লাগলেন বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হলে কি তাকে করতে হয়। চিঠিপত্রের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ থেকে বেছে বের করতে হ'ত কিছু সংখ্যক পত্র যা তার স্বামী পড়বেন। খ্যাতিপ্রত্যাশী যে-সব লোকেরা চিঠিপত্র লিখে সারাজীবন ধরে তার স্বামীকে বিরক্ত করবে এলসা সুকৌশলে সে-সব চিঠিপত্র বেছে এক ধারে সরিয়ে রাখত। আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবনের প্রচারের এই বিড়ম্বনা থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত একমাত্র এলসা।

তাঁর প্রতি অপরের মনোযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে আইনস্টাইন তন্ময় হয়ে থাকতেন নিজের কাজে। তার মত বা স্বভাবের একটুও পরিবর্তন হল না এতে। এত সব তোলপাড় যেন আর কাউকে নিয়ে ঘটছে এমনি নির্লিপ্তভাবে তিনি কাজ করে যেতেন। খবরের কাগজে নিজের ছবি দেখে তিনি হাসতেন। হাসতেন আর বলতেন, "মজার নাকওয়ালা এই থ্যাবড়ামুখো ভদ্রলোকটি কে?"

বিজ্ঞানবিদ্‌দের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে যেতে হত বিভিন্ন শহরে। এলসাকে ছেড়ে আইনস্টাইন কোথাও গেলে এলসার দিন কাটত ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে। এমনি এক যাত্রার সময় একবার তিনি স্বামীর সুটকেস্ সাজাতে সাজাতে তাঁকে হুঁশিয়ার করে বললেন, "যেদিন বক্তৃতা দেবে সেদিন বিকেলে পরবে তোমার এই কালো স্যুটটি। দেখে শুনে নাও, ভুল যেনো না হয়। এই ফরসা শার্টটা পরে নাও, আর এই নাও তোমার টাই আর এই তোমার মোজা।"

স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে আইনস্টাইন বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, "এলসা, তুমি সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও বড়েডা বেশী।"

তিনি ফিরে এলে এলসা এল স্যুটকেসটা খুলতে। খুলে দেখল, সেই স্যুট, শার্ট, মোজা—সবই যেমন পাটকরা ছিল তেমনি আছে, কেউ হাতও লাগায় নি। দেখেই তিনি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তুমি, বক্তৃতার দিন স্যুট্‌টা পরোনি দেখছি।"

"ঐ যা! ভুলেই গেছিলাম সে কথা।" দুষ্ট ছেলের মত তিনি হাসতে লাগলেন এলসার দিকে চেয়ে। তারপরে বললেন, "কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমি কি বলছি তাই শুনতে লোকজনেরা এসেছিল, আমার পোশাকের ফ্যাশন দেখতে কেউ আসেনি। তাই নয় কি?"

একথা শুনে এলসা জামাকাপড় তুলে রাখতে রাখতে নিরুপায়ভাবে শুধু তার স্বামীর দিকে চেয়ে একটু হাসল।

আজ তিনি যে দশের চোখে অতি বিখ্যাত ব্যক্তি আইনস্টাইন সে ব্যাপারে কোনই গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। প্যারিস অবজারভেটরী থেকে যখন তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল বক্তৃতা দেবার জন্য, তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় আরোহণ করে। স্টেশনে পেঁছে দীর্ঘ পথ তিনি দ্রুত হেঁটেই চলে গেলেন। তিনি বুঝতেও পারলেন না যে, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিরাট এক উন্মত্ত জনতা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলোর কাছে হতাশ হয়ে তখনও উঁকিঝুঁকি মারছে।

তাঁর জন্য স্বতন্ত্র কোন রকম ব্যবস্থা হোক, এটা আইনস্টাইন কখনও পছন্দ করতেন না। তিনি বরং দশের একজন হয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। একদিন তাঁর এক সহকর্মী অধ্যাপকের সঙ্গে একত্রে

গিয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল। তিনি তাই বন্ধুকে বললেন পথে এক ব্রিজের উপর তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। সেখানে গিয়ে দু'জন একত্র হবেন।

অধ্যাপকটি পড়লেন মুশকিলে। তিনি বললেন, "আমার রওয়ানা হতে একটু দেরি হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার জন্য আপনি অপেক্ষা করবেন তা' আমি চাইনে। কাজেই আপনি আপনার মত চলে যাবেন, আমিও আমার মত যাব।"

বন্ধুর কথা শুনে আইনস্টাইন বললেন, "তাতে আর ক্ষতি কি হতো? আমার কাজ সব জায়গায়ই চলতে পারে। আমার সমস্যা নিয়ে যেমন ডেস্কে বসে চিন্তা করতে পারি, তেমনি ব্রীজের উপর দাঁড়িয়েও করতে পারি।

নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে আইনস্টাইন এখন কিছুটা সজাগ হয়েছেন। তিনি জানেন, কোন ব্যাপারে তাঁর মতামত জনসাধারণের উপর এখন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই যে কোন ব্যাপারে তিনি সাবধান হয়ে মতামত দিতেন। কিন্তু ভাল কাজের জন্য যে তাঁর ক্ষমতা ব্যয় করা উচিত তাও তিনি জানতেন। কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করতে পারলে সে প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই জনসাধারণের যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পাবে। নতুন কোন মতামত, আবিষ্কার বা রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের জন্য অনেক অনুরোধ আসত আইনস্টাইনের কাছে কিন্তু তাঁর সমর্থন ছিল, শুধু মানবতার ব্যাপারে বা বিজ্ঞানের ব্যাপারে।

দীর্ঘকাল বার্লিনে বাস করার পরে তিনি প্রুশিয়ান নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি সাধ্যমত নীরবে দিন কাটাতে চেষ্টা করতেন, কারণ তিনি জানতেন দুনিয়ার অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর উপর। একটা গম্বুজের উপরস্থিত একটি কামরায় বসে তিনি কাজ করতেন। কামরাটির চারদিকে শুধু থরেথরে পুস্তক সাজানো। ছোট একটি সিঁড়ি দিয়ে সে কামরায় উঠতে হয়। বাড়ীর অন্য সব অংশের সঙ্গে এ কামরাটির কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বরাবরের মত এখনও তিনি হেঁটে বেড়াতে বের হন। পথে বের হলে লোকেরা যে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে সেদিকে তাঁর একটুও লক্ষ্য নেই। তাঁর উজ্জ্বল মুখচ্ছবি আর মাথার একরাশ এলোমেলো চুল এতদিনে সবারই পরিচিত হয়ে গেছে।

যতই দিন যেতে লাগল, জার্মানীতে ইহুদী বিদ্বেষ ততই বেড়ে চলল। কোন কোন জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদকে 'ইহুদী বিজ্ঞান' আখ্যা দিলেন এবং সমগ্র মতবাদের বিরোধিতা করতে সচেষ্ট হলেন। এর ফলে আইনস্টাইন স্বভাবতই দুঃখিত হলেন। কিন্তু দুঃখ তাঁর মতবাদ আক্রমণের জন্য নয়। বরং বিজ্ঞানী হয়েও তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করে ভাবতে পারতেন না বলেই তাঁর যত দুঃখের কারণ। যাঁরা তাঁর মতবাদ সমর্থন করতেন না এমন সব লোকদের বক্তৃতার আসরেও তিনি যোগদান করতেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনতেন, কখনো রাগ করতেন না বরং সময় সময় এমনভাবে মাথা নাড়তেন ঠিক যেন অন্য কোন অপরিচিত লোক সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে কখনো জার্মানীর বাইরে যেতে হলে তাকে তিনি অবসর বিনোদন বলে ভাবতেন। স্বদেশে যে অপ্রীতিকর আবহাওয়া জমে উঠছে তার থেকে কিছু সময় বাইরে থাকা তিনি পছন্দ করতেন। তা'ছাড়া নতুন সব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, সেই সঙ্গে নতুন দেশ দেখার আনন্দও কম নয়। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই লোকেরা ভিড় জমাতো তাঁকে দেখতে এবং তার বক্তৃতা শুনতে। তিনি হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সেখানে বছরের কয়েক সপ্তাহ মাত্র তিনি উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে বন্ধুদের সঙ্গে তার দিনগুলি বেশ আরামেই কাটত।

১৯২১ সালে একবার তাঁকে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে হ'ল একটি বিশেষ বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে। জনসাধারণের অভ্যর্থনার হাঙ্গামা ও গোলমাল থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর আগমনের সময়টা গোপন রাখা হয়েছিল। শুধু অধ্যাপক ফিলিপ ফ্রাঙ্ক স্টেশনে হাজির ছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। কয়েক বছর আগে এই অধ্যাপকটিই আইনস্টাইনের পরিত্যক্ত পদটি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ট্রেনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন আইনস্টাইনের অতীতের কথা। আজ আইনস্টাইনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। না জানি এতদিন কত পরিবর্তনই তাঁর ঘটেছে।

কিন্তু কোঁচকানো ওভার কোট গায়ে দিয়ে পুরানো টুপি মাথায় যে ভদ্রলোকটি একটি বেহালার বাক্স হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নামলেন

তাঁকে দেখে মোটেই বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে হল না। অতীতের তাঁর সেই প্রীতিপূর্ণ হাসি এবং চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি কিন্তু আজও ঠিক তেমনি আছে।

সে রাত্রে শ্রোতার এত ভিড় হয়েছিল যে সভাকক্ষে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। তাদের মধ্যে হয়ত এমন লোকও ছিল যারা আইনস্টাইনের বক্তব্যের কিছুই বুঝতে পারেনি কিন্তু তবু তারা এসেছিল বিখ্যাত এই বিজ্ঞানবিদ্‌কে চোখে দেখতে।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে এক মজলিশের আয়োজন করলেন। উপস্থিত সবাই বক্তৃতা দিলেন আইনস্টাইনকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়ে। তারপর যথারীতি তাঁকেও অনুরোধ করা হল কিছু বলতে।

আইনস্টাইন বললেন, "তার চেয়ে ভালো হবে যদি আমি আপনাদের বেহালা বাজিয়ে শোনাই। সেটা আপনাদের বুঝতে এবং উপভোগ করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।"

এই বলে বেহালাটি বের করে তিনি কয়েকটি গৎ বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন।

এগার

১৯২১ খ্রীস্টাব্দ। নিরানন্দ এপ্রিলের এক ভোরবেলা ইউরোপ থেকে পাড়ি দিয়ে রটারডাম জাহাজখানা ধীরে ধীরে এসে ঢুকল নিউইয়র্কের উপসাগরে। জাহাজের উপরের তলায় একটি লোক সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন রেলিং-এ ভর করে। দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ স্বাধীনতা মূর্তির উপর। কুয়াশার ভেতর দিয়ে মূর্তিটি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

ভদ্রলোকটির মাথায় টুপি নেই। বাতাস এসে তাঁর লম্বা লালচে রং-এর চুলগুলি প্রশস্ত কপালের উপর থেকে উড়িয়ে নিচ্ছিল পেছনের দিকে। তাঁর কলারের ফাঁকে নেক-টাইয়ের গ্রন্থিটি দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট

বড়। তাঁর চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি তখনও পড়ে আছে সেই স্বাধীনতা মূর্তির উপরে। ঠোঁটে তাঁর মৃদু হাসির রেখা।

"অ্যালবার্টেল।" মৃদুকণ্ঠের ডাক শুনে তিনি পাশে চেয়ে দেখতে পেলেন স্ত্রী এলসা তাঁকেই হাত ইশারায় ডাকছেন। "এসো, এখন আমাদের এর পরের ডেকে যেতে হবে। সবাই বলছেন, সেখানে খবরের কাগজের সব লোকেরা আসবেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।" এই বলে তাঁর বাহুতে নিজের বাহু রেখে তাঁকে নিয়ে চললেন।

আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্রে এই তাঁর প্রথম আগমন। আমেরিকার স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রকে বরাবরই তিনি প্রশংসা করে এসেছেন।

খবরের কাগজওয়ালাদের সঙ্গে দেখা করতে-যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সে-জন্য জাহাজের কাপ্তেন আগে থেকেই বুদ্ধি করে ডেকের কিছুটা জায়গা ঘেরাও করে রেখেছিলেন দড়ি টানিয়ে।

জাহাজটি জেটীর গায়ে লাগতেই দলে দলে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিক হুড়মুড় করে এসে উঠল জাহাজে। ঘেরাও করা জায়গায় ঢুকে তারা তাদের কাজে লেগে গেল।

'এদিকে একটু তাকাবেন, স্যার! এবার এদিকে। একটু হাসুন অনুগ্রহ করে। এবার ওপরের দিকে তাকান, হয়েছে, এবার তাকাবেন নীচের দিকে। বসুন, উঠে দাঁড়ান। হাত নেড়ে আনন্দ জ্ঞাপন করুন, হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে আরেক বার-----'

ফটোগ্রাফাররা কাজ করে যাচ্ছে ভয়ানক ব্যস্তভাবে। ভালভাবে দেখতে পাবার জন্যে তাদের কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে রেলিং-এর উপর, কেউ বসেছে হাঁটু গেড়ে, আর একে অপরকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। আর যাঁকে নিয়ে এতসব হট্টগোল তিনি সব অনুরোধ রক্ষা করে চলেছেন হাসিমুখে নির্বিকারভাবে। কোন কোন সময়ে তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে জিজ্ঞাসার ভাব। তিনি এলসার দিকে চেয়ে একবার মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, "হায়রে খোদা, আমার নিজকে মনে হচ্ছে গীতবাদ্যের আসরে প্রধান গায়িকার মত।"

অবশেষে ফটোগ্রাফাররা সবাই সন্তুষ্ট হল, এবার রিপোর্টারদের পালা। নোট বই আর পেন্সিল হাতে আইনস্টাইনকে ঘিরে ধরে তারা নানান প্রশ্ন করতে লাগল আর লিখতে লাগল ব্যস্তভাবে।

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কেমন লাগছে আপনার?"

"কিন্তু আমার তো কিছুই এখনও দেখাই হল না।"

"কত দিন আপনি এখানে থাকবেন?"

"এখনও ঠিক বলতে পারি না।"

"আপনার আপেক্ষিকবাদ এক কথায় বোঝাতে পারেন?"

"না!"

"পৃথিবীর কতজন লোক আপনার মতবাদ বুঝতে পেরেছে?"

"যে-কোন পদার্থবিজ্ঞানী তা বুঝতে চেষ্টা করবেন তিনিই পারবেন বুঝতে।"

"আপনার মতবাদ যারা বুঝতে পারে না, বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ে যাদের তেমন আগ্রহ নেই এমন সব লোকও আপনার ব্যাপারে এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে কেন বলতে পারেন?"

তিনি ভেতরে একটু বিরক্তি বোধ করলেন। বললেন "ও রকম অদ্ভুত ব্যাপার কেন ঘটে তার সঠিক কারণ বের করতে হলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন।"

"আপনার আপেক্ষিকবাদের নাম শুনে মেয়েরা এমন উৎসাহিত হয়ে ওঠে কেন বলতে পারেন?"

আইনস্টাইন মাথা উঁচিয়ে হেসে উঠলেন সশব্দে। হেসে বললেন, "এর কারণ মেয়েরা নতুন নতুন ফ্যাশান পছন্দ করে, আর এ বছরের ফ্যাশান হল আপেক্ষিকবাদ-----"

এলসা আপন মনে দাঁড়িয়েছিল একটু পেছনের দিকে। বরাবরই সে তাই থাকে। একজন সাংবাদিক তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ কুশলী, মিসেস আইনস্টাইন?"

"আমার গণিতের জ্ঞান সংসারের হিসেবপত্র রাখার কাজে সীমাবদ্ধ।"

"আপনি আপেক্ষিকবাদ বুঝতে পারেন?"

নাসিকা কুঞ্চিত করে একটু হেসে তিনি জবাব দিলেন, "আমার নিজের সুখী হবার জন্য আপেক্ষিকবাদ বুঝবার কোন প্রয়োজনই নেই।"

অবশেষে সাংবাদিক-সাক্ষাৎকারের পালা শেষ হল, আইনস্টাইন-দম্পতি ফিরে এলেন তাঁদের কেবিনে। সরকারীভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিলেন একটি দল। প্রাথমিক অভ্যর্থনার কাজ শেষ হলে তাঁদের নিয়ে ওঠানো হল প্রকাণ্ড একখানা

খোলা গাড়ীতে। তাঁদের গাড়ীর পিছনে আরও অনেকগুলি গাড়ী মিলে মিছিল করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল সিটি হলের দিকে।

রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য লোকের ভিড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা অপেক্ষা করছে এ লোকটিকে একটি নজর দেখবার জন্য। আইনস্টাইনের প্রকাণ্ড গাড়ী দৃষ্টিগোচর হতেই তারা হর্ষধ্বনি করে উঠল, সবাই হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী সব বাড়ীর কর্মরত লোকেরা কাজ ফেলে ছুটে এল জানালার পাশে। রাশি রাশি সাদা কাগজের টুক্‌রা আর কাগজের ফিতা উপর থেকে রাস্তায় ঢেলে দিয়ে তারা তাদের আনন্দ জ্ঞাপন করতে লাগল।

আইনস্টাইন তাঁর গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর পর মাথা নেড়ে, হাত নেড়ে তিনি অভ্যর্থনার জবাব দিচ্ছেন, একটু একটু হাস্‌ছেন। কাগজের টুকরা এসে তাঁর এলোমেলো চুলে আটকা পড়ে যাচ্ছে, কাগজের ফিতাগুলি পড়ছে কাঁধে।

তিনি শান্তভাবেই সবকিছু গ্রহণ করলেন। এ-রকম অভ্যর্থনায় আগে থেকেই তিনি কিছুটা অভ্যস্ত। তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন, এ অভ্যর্থনার অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো সহজ পন্থা নেই। বরাবরই তিনি সাদাসিদা সহজ প্রকৃতির লোক। কাজেই, এ সব জাঁকজমক বাদ দিয়ে বন্ধুভাবে কেউ তাঁকে গ্রহণ করলেই তিনি খুশী হতেন বেশী। জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় বা তাদের প্রশংসা অর্জন করা যায় স্বেচ্ছায় এমন কোন কাজ জীবনেও তিনি করেন নি।

সিটি হলে প্রথমেই আইনস্টাইনকে অভ্যর্থনা জানালেন মেয়র। তিনি অতিথিকে একটি চাবি উপহার দিলেন। তার অর্থ হল, সমগ্র নিউইয়র্কের তিনি অতিথি। ছয় সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণ, বক্তৃতা ও অভ্যর্থনার শুরু হল এখানে। যেখানেই তিনি গেছেন জনগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করেছে বিপুলভাবে। ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হার্ডিং। আইনস্টাইন বক্তৃতা দিলেন প্রিন্সটনে, হারভার্ডে এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মে মাস তখন শেষ হয়ে এসেছে। দেশে ফিরবার আগের রাত্রে এক বিপুল বিদায় ভোজের আয়োজন করা হল নিউইয়র্কের হোটেল অ্যাস্টরে। এ ভোজসভায় আমেরিকার বহু বিখ্যাত ইহুদী যোগদান

করেছিলেন। এ ভোজের লভ্যাংশ ফেব্রিস্তিনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভবন তৈরীর কাজে ব্যয় হবার কথা হয়েছিল। আইনস্টাইন এ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এর সমর্থন করছিলেন। সাংবাদিকদের তিনি বলছিলেন, "জার্মানীতে এবং ইউরোপের অপর আরও অনেক শহরে ইহুদীদের জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আশা করি এমন একটি প্রতিষ্ঠান একদিন গড়ে উঠবে যেখানে তারা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীন এবং খোলাখুলিভাবে যেতে পারবে।"

একজন সাংবাদিক বললেন, "কিন্তু আপনি ত একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর কাজের সঙ্গে দাতব্যের কোনো সম্পর্ক নেই।"

আইনস্টাইন সাংবাদিকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে উঠলেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে বিজ্ঞানী হলেও আমি একজন মানুষ। মানবতার প্রশ্ন সকলের আগে, তারপরে বিজ্ঞান এবং আর সব কিছু।"

"আপনি কি মনে করেন কলেজে শিক্ষার সত্যিই কোনো প্রয়োজন রয়েছে? বই পড়েই সবকিছু জ্ঞাতব্য আমরা জেনে নিতে পারি না কি?"

"পাঠ্য-বইতে যে-সব সাদামাটা জিনিস পাওয়া যায় ব্যক্তিগত-ভাবে আমি কখনো তা দিয়ে আমার স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত করতে পছন্দ করি না। কিন্তু কলেজে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল মনকে চিন্তা করতে শিখানো। এ কারণে কলেজের শিক্ষা অমূল্য সম্পদ।"

পরের দিন এই সুখী দম্পতি জাহাজে চড়ে স্বদেশের দিকে রওয়ানা হলেন। বিপুল অভ্যর্থনার হট্টগোলের ভেতর আইনস্টাইন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দেখে গেলেন আর দেখলেন ট্রেনের জানালা দিয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি এ দেশের অতুলনীয় স্বাধীনতার রূপ দেখে গেলেন। তাঁর মনের নিভৃত কোণে ক্ষীণ আশা জেগে রইল, হয়ত কোনদিন এ দেশই তাঁর স্বদেশ হয়ে উঠতে পারে। অনেকদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছিলেন, জার্মানী ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, সত্যিই যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমেরিকায় হয়ত তিনি আশ্রয় পাবেন।

বার

আইনস্টাইন দম্পতি নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করে সরাসরি জার্মানীতে ফিরে এলেন না। কথা ছিল, আইনস্টাইন লণ্ডনের কিংস্ কলেজে গিয়ে তাঁর আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। কাজেই ফিরবার পথে তাঁরা লণ্ডনে দিন কয়েক কাটিয়ে যাবেন বলে স্থির করলেন।

লণ্ডনে তাঁদের থাকবার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে তার কিছুই তাঁরা জানতেন না। তাঁরা জানতেন, লর্ড হেলডেনের গৃহে তাঁরা অতিথি থাকবেন। মূল্যবান একখানা চক্‌চকে মোটরগাড়ী তাঁদের নিয়ে হাজির করল ২৮, কুইন এনস্ গেটের চমৎকার বাড়ীতে। পর্টিকোর নীচে গিয়ে মোটর থামতেই উর্দি পরা একজন ভৃত্য এসে ত্রস্তভাবে দরজা খুলে দাঁড়াল। আইনস্টাইন তাঁর বেহালা খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন, ভৃত্যেরা আগেই তাঁদের মোটঘাট নামিয়ে ফেলেছে।

লর্ড হেলডেন এসে যথারীতি আইনস্টাইন-দম্পতিকে সাদর অভ্য-র্থনা জানালেন। পরে উর্দি পরা অপর একজন ভৃত্যের অনুসরণ করে তাঁরা উপরে গিয়ে উঠলেন। ভৃত্য উঁচু ছাদওয়ালা চওড়া বারান্দা পার হয়ে তাঁদের নিয়ে গেল একটি কামরার সামনে। দরজা খুলে অতিথিদের সেই কামরায় ঢুকতে দেবার জন্য সে নিজে এক পাশে সরে দাঁড়াল। একটু ইতস্ততভাবে আইনস্টাইন ও তাঁর স্ত্রী ভিতরে ঢুকলেন।

তাঁরা মনে করেছিলেন এটাই হয়ত তাঁদের শয়নকক্ষ কিন্তু তা নয়। বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা চারপাশ দেখতে লাগলেন। তাঁরা প্রথমে ভাবলেন, হয়ত এটি বল নাচের একটি কামরা। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন তাঁদের মোটবহর সব সেখানে এনে রাখা হয়েছে। প্রকাণ্ড কামরাটার মধ্যখানে সেগুলোকে দেখা যাচ্ছে অকেজো সামান্য জিনিসের মত।

ঐ যে, পড়ে আছে বেহালাটা—আইনস্টাইনের অতি আদরের বস্তু। আইনস্টাইন এগিয়ে গিয়ে আদরের বেহালাটা তুলে নিলেন। কিন্তু ভৃত্য ছুটে এসে বেহালাটার বাক্সটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বলল, "আমাকে হুকুম করুন, স্যার।" বলেই সযত্নে একটি চেয়ারের উপর রেখে বাক্সটি খুলে দিল।

আইনস্টাইন একটু অস্বস্তির দৃষ্টিতে এলসার দিকে চাইলেন। এলসা তখন একটা কিছু করবার অছিলায় নিজের একটা স্যুট্‌কেস তুলেছেন।

ভৃত্য তাঁর হাত থেকে স্যুট্‌কেসটি নিয়ে বলল, "আমাকে অনুমতি করুন, মাদাম। ক্লারা এসে খুলে দেবে, মাদাম।" বলে সে মাথা নীচু করে এলসাকে অভিবাদন করল। তারপর আইনস্টাইনকে অভিবাদন করে বলল, "আমি খুলে দেব আপনারটা, স্যার।"

আইনস্টাইন সুট্‌কেসগুলির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন এলসার দিকে চেয়ে। এলসা হতাশভাবে চেয়ে আছেন ভৃত্যের দিকে। ভৃত্যটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে হুকুম পেলেই ছুটবে সুট্‌কেস খুলে দিতে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তখন আইনস্টাইন কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিড় বিড় করে কি যেন বললেন এলসাকে। এলসা ভৃত্যটির দিকে ফিরে ধীর শান্তভাবে বললেন, "তোমাকে পরে ডেকে পাঠাব—এখন বরং চলে যাও, ধন্যবাদ।" ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে তিনি কথাগুলি বললেন।

ভৃত্য পুনরায় অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে বলল, "ধন্যবাদ, মাদাম। আমার দরকার হলেই দয়া করে ঘণ্টা বাজাবেন।" এই বলে সে ঘণ্টার দড়িটি দেখিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। পরের মুহূর্তেই আইনস্টাইনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল এবং দেখতে দেখতে মৃদু হাসি অট্টহাসিতে পরিণত হল। পরে এলসাও না হেসে পারলেন না। সারাটা কামরা যেন আনন্দে ভরে উঠল।

সেদিনের নৈশভোজ ছিল একটা স্মরণীয় ব্যাপার। লণ্ডনের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কেউ বাদ পড়েন নি সে ভোজসভায়। রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এডিংটন, বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ', ক্যান্টারবেরীর আর্চ বিশপ এবং আরও অনেকে রয়েছেন

উপস্থিত। সবাই আলোচনা করছেন আইনস্টাইনের কার্যাবলী সম্বন্ধে।

আর্চ বিশপ বসেছিলেন ঠিক আইনস্টাইনের পাশেই। আজকের মত এমনি একটি সুযোগই তিনি খুঁজছিলেন। কারণ, আপেক্ষিকবাদ ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁর একটা অস্বস্তির ভাব এসে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বই পড়ে তাঁর ধারণা আরও মনে তালগোল পাকিয়ে গেছে। তিনি ভাবতেন, ইংল্যাণ্ডে গীর্জার প্রধান ব্যক্তি হিসাবে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এমন সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর কিছুটা জ্ঞান থাকা উচিত। তিনি নিজকে বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে করতেন অথচ আইনস্টাইনের মতবাদ তাঁর কাছে মনে হত অবোধ্য।

তিনি আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন তো অধ্যাপক আইনস্টাইন, আপনার আপেক্ষিকবাদের সঙ্গে ধর্মের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আইনস্টাইন সরাসরি বললেন, "কোন সম্পর্ক নেই।"

আর্চ বিশপ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই বিদ্‌ঘুটে বিষয় সম্বন্ধে তাঁর তা'হলে আর মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।

পরের দিন সন্ধ্যা বেলা শ্রোতায় ভর্তি হয়ে গেল সভাকক্ষ। জনসাধারণ আইনস্টাইনকে কিভাবে গ্রহণ করবে তাই নিয়ে একটা অস্বস্তির ভাব ছিল মনে। জার্মান-যুদ্ধক্ষতের তীব্র জ্বালা ইংল্যাণ্ড তখনও পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। কাজেই, আশঙ্কা ছিল একদল লোক হয়ত এই জার্মান বিজ্ঞানীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে চাইবে না।

শ্রোতাদের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। লর্ড হেলডেনের সঙ্গে আইনস্টাইন এসে মঞ্চের উপর পাশাপাশি আসন দখল করতেই একটা মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ উঠল তাদের মধ্যে। কিন্তু যথা সময়ে এক ইংরেজ সুপুরুষ উঠে ধীরপদে মঞ্চের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। সহসা গুঞ্জরণ থেমে গেল, যেন পানি ঢেলে দেওয়া হল আগুনে।

লর্ড হেলডেন মাথা তুলে সমবেত শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আজকের এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী শুধু জার্মান বলে কি

লোকগুলি তাঁর বিরোধিতা করবে? তাঁরা কি অতিথিকে সম্মান জানাতে আসেননি? উপস্থিত সবাই কি আপেক্ষিকবাদের মত কঠিন ব্যাপারে এতটা আগ্রহশীল? অথবা তারা শুধু গোলমালের সৃষ্টি করতেই এসেছে?

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "আজকে সন্ধ্যায় একজন প্রতিভাবান লোককে আমরা সত্যিকার ইংরেজের মত অভ্যর্থনা জানাতে এখানে সমবেত হয়েছি।" সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি পড়েই আবার থেমে গেল। লর্ড হেলডেন সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিয়েই আইনস্টাইনকে সামনে এনে দাঁড় করালেন। আইনস্টাইন জানতেন, যে দেশে তিনি এসেছেন সেখানে এখনও জনগণের মধ্যে জার্মানবিরোধী মনোভাব রয়েছে। দর্শকদের মধ্যে তিনি কিছুটা নিরুৎসাহের ভাবও লক্ষ্য করলেন।

ধীরে ধীরে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। গলার স্বর তাঁর এত মৃদু যে পিছনের সারিতে তা পৌঁছেই না। সবারই বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশে এসে যে তিনি খুব খুশী হয়েছেন আইনস্টাইন তাই বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তারপরে বলে গেলেন, বিজ্ঞান শুধু বেড়েই চলে, চলার পথে ভৌগোলিক সীমা মেনে চলে না। বিজ্ঞান সকলের জন্য, সকল দেশের জন্য। নিউটনের আবিষ্কার দ্বারাও সারা দুনিয়া উপকৃত হয়েছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে দেখে বক্তার প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বক্তার ব্যক্তিত্ব শ্রোতাদের মনের তিক্ততা দূর করতে সমর্থ হল।

আপেক্ষিকবাদ ছাড়াও আইনস্টাইন বিজ্ঞান-জগতের অন্যান্য অনেক কথা বললেন। বলতে বলতে তিনি আত্মভোলা হয়ে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে নিজে তিনি জার্মান এবং তাঁর শ্রোতারা ইংরেজ। তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং তাঁর শ্রোতারা সবাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহশীল। তাঁর মনের অসামান্য ঔদার্য সবার অন্তর জয় করে ফেলল, শ্রোতাদের কারও ভেতরেই সে রাত্রে বন্ধুভাবের কোন অভাব দেখা গেল না। বরং তাঁর উপস্থিতি যেন দুইটি দেশের ব্যবধান অনেকখানি কমিয়ে দিল।

অবশেষে আইনস্টাইন দম্পতি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে স্বদেশের পথে রওয়ানা হলেন। বিদেশে দীর্ঘ সফরের পর স্বদেশের পরিচিত পরিবেশে নিজের বাসগৃহে ফিরে আসা সত্যিই বড় সুখের।

স্যুট্‌কেসগুলি যেমন রাখা ছিল তেমনি পড়ে আছে। শোবার ঘরের সাদা পরদা-ঝোলান জানালা, উজ্জ্বল বাতিগুলি, পিয়ানোটি—সবই যেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ভেলভেট মোড়া সোফায় এলসা এসে বসে পড়লেন কৃতজ্ঞতা সহকারে। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সেদিনের সন্ধ্যায় নিঃশব্দ আলো-আঁধারী তাঁর মনে এনে দিল একটা প্রশান্তির ভাব।

তারপর ধীরে ধীরে এলসা লক্ষ্য করলেন, ঘর ভরে উঠেছে বাদ্যের সুরে। তিনি মাথা তুলে চাইলেন। তার স্বামী তখনও গায়ের কোট খুলে রাখেন নি। তিনি তাঁর প্রকাণ্ড আরাম-কেদারাটি দখল করে আপন মনে চিরপ্রিয় বেহালাটি বাজিয়ে চলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে সুদূরাগত একটা শান্তির ভাব।

তেরো

আইনস্টাইন-দম্পতি স্বগৃহের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি শান্তিনীড়ে ফিরে এলেন সত্য, কিন্তু জার্মানীতে বিশেষ করে বার্লিনে যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে তার থেকে রেহাই পাবার আশ্রয়স্থল এ নয়। যুদ্ধ সারাটা দেশকে যেন কসাইখানায় পরিণত করে গেছে। দেশের লোকের জন্য কোন কাজ নেই করবার। বেকার সমস্যা এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে ব্যবসায়ী বা শ্রমিক সবাই ভিক্ষা করছে পথে পথে।

অতীতের গর্বিত জার্মানীর দরিদ্র ও ভগ্নহৃদয় লোকেরা এখনও বিশ্বাস করছে না যে তাদের ভুল ও ধৃষ্টতাই তাদের পতনের মূল। তাদের এ দুর্ভোগের জন্য নিজেদের দায়ী তারা করতে রাজী নয়, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তারা খুশী। তাদের চোখে ইহুদীরাই দোষী সবচেয়ে বেশি। ইহুদীদের পক্ষে জার্মানীতে জীবিকার্জন করা ক্রমশ অসম্ভব

হয়ে উঠল। তাদের প্রতি যে একটা ঘৃণার ভাব ক্রমশ বেড়ে উঠছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রতি কাজে তারা তা অনুভব করতে লাগল।

আইনস্টাইন সারা দুনিয়ার শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন এবং অসামান্য শ্রদ্ধা ও সম্মানই তাঁকে ক্লেদাক্ত অবস্থা থেকে এতদিন রক্ষা করেছিল। কিন্তু তা হলেও তিনি নিজে ইহুদী, কাজেই তিনি নির্যাতিত এসব ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ সময়েই জীবনে তিনি প্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইহুদী সমাজে যোগদান করলেন, জীবনে প্রথম তিনি নির্যাতিত লোকদের সাহায্যের জন্য নিজের পদমর্যাদাশক্তি নিয়োগ করলেন।

তাতে কোন সুফল দেখা গেল না। এর ফলে বরং কিছু সংখ্যক জার্মান তাঁর উপরেও বিরূপ হয়ে উঠল। অনেকে তাকে শাসিয়ে চিঠিপত্র লিখতে লাগল, কেউ কেউ তাঁর বক্তৃতার সময় নির্মম উক্তি করতেও ছাড়ল না।

তাঁর অর্থবল ছিল খুব কম। তাঁর বেতন খুব বেশী ছিল না এবং তিনি কোন রকম আর্থিক দান বা পারিতোষিক গ্রহণ করতেন না। কিন্তু এখন তিনি দাতব্যের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানেও যোগদান করতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর উপস্থিতি তখনও বিপুল জনসমাবেশে যথেষ্ট সাহায্য করত। জার্মানীর কেন্দ্রস্থলে কোন এক শহরে দরিদ্র জনগণের সাহায্যার্থে একবার ঐক্যবাদনের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি বেহালা বাজাতে রাজী হয়েছিলেন। একজন অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিল সংবাদ প্রেরণের জন্য। তখনও ঐক্যবাদন শুরু হয়নি। পাশে বসা এক মহিলাকে ফিস্ ফিস্ করে সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, "আজ রাত্রে যিনি বেহালা বাজাবেন সেই আইনস্টাইন লোকটি কে?"

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম শোনেনি এমন একটি লোকও জার্মানীতে আছে ভেবে মহিলা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন, "হায় খোদা, তাও তুমি জানো না? এই-ই সেই বিখ্যাত আইনস্টাইন!"

ব্যস্তভাবে লিখতে লিখতে তখন সেই যুবক বলল, "ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।"

পরের দিন কাগজে খবর বের হল, বিখ্যাত বাদক আইনস্টাইন বেহালা বাজনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর মত বেহালা-বিশারদ" দ্বিতীয় আর কেউ উপস্থিত ছিল না সে রাত্রে ইত্যাদি।

আইনস্টাইন যখন সেই অদ্ভুত সংবাদ পড়লেন তখন অট্টহাসিতে ভরে গেল তাঁর গৃহ। "বিখ্যাত বাদক আইনস্টাইন-----বেহালা-বিশারদ" তিনি বারবার পড়েন আর হাসেন। হাসতে হাসতে পানি এসে গেল তাঁর চোখে।

দুনিয়ার সর্বত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আইনস্টাইনের প্রশংসাসূচক অনেক কাহিনী ছাপা হয়েছে। জীবনে অনেক পদক, পারিতোষিক ও উপহার সামগ্রী পেয়েছেন তিনি। তিনি সে সব কাউকে দেখাতেন না, নিজেও সে সব দেখতে চাইতেন না, বলতেন, এসব পাবার যোগ্যতা তাঁর নেই। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর ঐক্যবাদনের এ সংবাদটির কথা স্বতন্ত্র। একেবারে ক্ষয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি কাগজের এ টুকরাটি বরাবর সঙ্গে রেখেছেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি বন্ধুদের বলতেন, "তোমরা মনে করো আমি বিজ্ঞানী, তাই নয় কি? হ্যাঁ, আমি বেহালাবিশরদ, তাই সত্য।" এই বলে তিনি গর্বের সঙ্গে সেই কাগজের টুকরাটি পকেট থেকে বের করতেন। হাসি উপচে পড়ত তাঁর মুখে চোখে।

যুক্তরাষ্ট্র সফর করে ফিরে আসবার কয়েক মাস পরেই তিনি জাপানে গিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে রাজী হলেন। এলসা খুশী হলেন এবং স্বস্তি বোধ করলেন। জার্মানীর ক্রমবর্ধমান অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে স্বামীকে দূরে রাখতে পারলেই তিনি খুশী। আইন-স্টাইন নিজে অবশ্যি বিপদের আশঙ্কার কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুরা বরাবরই তাঁর নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করতেন, কারণ আইনস্টাইন রাস্তা চলতে গিয়ে চিন্তায় এত মগ্ন হয়ে যেতেন যে দু'পাশে কি ঘটছে সেদিকে আদৌ লক্ষ্য করতেন না।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দেব শেষ দিকে আইনস্টাইন প্রাচ্য সফরের উদ্দেশ্যে জাহাজে চাপলেন ফ্রান্সের মারসেলিস্ বন্দরে। জাপানী জাহাজ তাঁদের নিয়ে মিশর, ভারত, চীনের বহু বন্দরে ভিড়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চল্‌ল। প্রত্যেক বন্দরে সাড়া পড়ে যেত আইনস্টাইনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, তাঁকে উপহার সামগ্রী দেবার জন্য। জাপানে যেদিন গিয়ে তিনি উঠলেন সে দিনটি জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা

হল। জাপানের সম্রাজ্ঞী নিজে অভ্যর্থনা জানালেন এই সম্মানিত অতিথিকে।

জাপানের জনগণ দলে দলে এসে যোগদান করল তাঁর বক্তৃতা সভায়। একজন যোগ্য দোভাষী বরাবর তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে তাদের শোনালেন। যে ভাষায় আইনস্টাইন তাদের কাছে বক্তৃতা দিলেন তা যেমন অবোধ্য ছিল তেমনি অবাধ্য ছিল বক্তৃতার বিষয়। তবু নিশ্চল শ্রোতারা ঘন্টার পর ঘন্টা যে ধৈর্যসহকারে তা' শুনল তাই দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

একদিন তিনি এক বক্তৃতায় চার ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। শ্রোতাদের অসুবিধার কথা ভেবে তিনি ঠিক করলেন, পরের দিনের বক্তৃতা সংক্ষেপ করবেন। সত্যি সত্যিই পরের দিনের বক্তৃতা দু'ঘণ্টায় শেষ করতে পেরে তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু তাঁর সে খুশীর ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তাঁর নিয়ন্ত্রণ কর্তাদের মধ্যে একটি দিরুৎ-সাহের ভাব দেখা দিল। তাঁরা অনুযোগ করে বললেন, আমাদের শহরের অধিবাসীরা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কারণ অন্যান্য শহরে আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন চার ঘণ্টা ধরে আর আমাদের বেলা মাত্র দু'ঘণ্টা।"

এই বহুবিচিত্র দেশে এসে অবসর পেলেই আইনস্টাইন পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন দেশের লোকজন ও রীতিনীতি দেখবার আগ্রহে। শহরের অলিগলিতে বা বন্ধুর পথে চলাফেরার জন্য তাঁকে একটা রিক্‌শা দেবার প্রস্তাব হতেই কিন্তু তিনি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে বলে উঠলেন, "একজন মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করব এবং সে আমাকে ব'য়ে বেড়াবে তা' কখনই আমি হতে দেব না।"

জাপানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর আইনস্টাইন-দম্পতি স্বদেশে রওয়ানা হলে শুধু যে জাপানবাসীদের শুভেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে এলেন তাই নয়, কয়েকটি বাক্স ভর্তি করে নানারকম উপহার-সামগ্রীও নিয়ে এলেন। এ ভ্রমণের স্মৃতি স্বপ্নের মত জেগে রইল তাঁদের মানসপটে।

ফেরবার পথে তাঁরা ফিলিস্তিনে গেলেন। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের গৃহে তাঁরা অতিথি হলেন। সেখানে সবকিছু কাজই হত অনুষ্ঠানিক-ভাবে। যতবার হাইকমিশনার তাঁর গৃহের বাইরে যেতেন ততবার একটি করে তোপধ্বনি করা হত। গৃহপ্রাঙ্গণে প্রায় সর্বদাই কুচ-কাওয়াজ করত সুসজ্জিত সেনাদল।

এসব দিকে আইনস্টাইন মোটেই মনোযোগ দিতেন না। এসব আদব কায়দা অগ্রাহ্য করে তিনি চলতেন নিজের মতেই সহজ সরল ভাবে। বেচারী এলসা অবশেষে ত্যক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমি সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী। এসব বাহুল্য কায়দা-কানুন আমি পছন্দ করি না।"

স্ত্রীর অনুযোগ শুনে আইনস্টাইন সান্ত্বনার সুরে বললেন, "একটু ধৈর্য ধরে থাকো। আমরা তো শীগ্‌গীরই বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।"

"তুমি হলে একজন বিখ্যাত লোক। তোমার পক্ষে ধৈর্য ধরা সহজ। তুমি যদি আদব-কায়দায় কোনো ভুল করো বা নিজের খেয়ালখুশী মতো চল তা'হলে লোকে তা তেমন গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু আমার বেলা খবরের কাগজ পেছন লেগেই আছে। দূরে দেখবার ক্ষমতা আমার একটু কম বলে তারা বলছে আমি নাকি সালাদের পরিবর্তে প্লেটের কাছে রাখা ফুলের পাপড়ি ভুল করে খেয়ে ফেলেছি। সত্যি তাই করছে তারা!"

এই প্রাচ্য ভ্রমণে রত থাকা অবস্থাতেই তাঁরা কয়েকটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেলেন। সুইডিস এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স পদার্থবিজ্ঞানের জন্য আইনস্টাইনকে সে বছর জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করলো। এ সংবাদে সারা জার্মানী মেতে উঠল আনন্দে। যুদ্ধের পরে জার্মানী নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হল এই প্রথম। পুরস্কার পেয়ে জার্মানীর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি অনেকখানি কমে গেল। সে সময়ের জন্য তারা ভুলে গেল যে আইনস্টাইন একজন ইহুদী, বরং আইনস্টাইন যে জার্মান এজন্য তারা গর্ববোধ করতে লাগল।

কয়েক সপ্তাহ মাত্র গৃহে কাটিয়ে আবার ভ্রমণে বের হলেন। এবার রওয়ানা হলেন সুইডেনের রাজার কাছে নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে। নোবেল প্রাইজ অমনিতেই অমূল্য সম্পদ তার উপর রয়েছে চল্লিশ হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার। কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে অর্থের মূল্য খুবই কম, কারণ তাঁর অভাব ছিল সামান্য এবং তা, পূরণ হত সহজে। তিনি সমস্ত অর্থ সুইজারল্যাণ্ডে মিলেভার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ছেলেদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে।

তারপর তিনি আবার নিজের কাজ আরম্ভ করবার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন চিন্তা তাঁর মনে উঠেছে। এবার সেগুলিই তিনি কাজে লাগাতে চান।

চৌদ্দ

পরবর্তী কয়েকটি বছর আইনস্টাইন বার্লিনেই কাটালেন। মাঝে মাঝে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে বেড়াতে যেতেন। তা' ছাড়া ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি কয়েক সপ্তাহ দক্ষিণ আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন।

বার্লিনে এখন আইনস্টাইনই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। বার্লিনে যারা বেড়াতে আসত তারা প্রথমেই যেত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে এক নজর দেখবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারত। সময় সময় ভাগ্যবান লোকেরা তাঁকে ক্লাসে অধ্যাপনায় ব্যস্ত দেখতে পেত। তারাও তখন গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত। আইনস্টাইন তাতে একটুও বিরক্তি বোধ করতেন না। তিনি যথারীতি বক্তৃতা চালিয়ে যেতেন কোনও দিকে লক্ষ্য না করে। কয়েক মিনিট পরে শ্রোতাদের কৌতূহল মেটাবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে তিনি বলে উঠতেন, "আমার বক্তব্য শুনবার বিশেষ প্রয়োজন যাদের নেই তাদের চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্য এবার আমি একটু থামব।" তারপর তারা চলে গেলে খুশী মনে তিনি শুধু তাঁর ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে থাকতেন।

জীবনে এমন অনেক আগন্তুকই তাঁর কাছে অনধিকার প্রবেশ করেছে কিন্তু তাই বলে তিনি কখনো বিরক্তি বোর করেন নাই। তাঁকে দেখবার জন্য মানুষের এতটা আগ্রহ কেন তিনি তা' ভেবেই পেতেন না। জগৎজোড়া খ্যাতি যে ভাবে তিনি পেয়েছেন এগুলিকেও তিনি সে ভাবেই গ্রহণ করতেন এবং এ দু'টি ব্যাপারকেই তিনি নিরর্থক মনে করতেন।

এলসা শুধু যে তাঁর স্বামীর চিঠিপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতেন তাই নয়, স্বামীর দর্শনপ্রার্থীদেরও তিনি বাছাই করে দিতেন। প্রতি

দিনই অনেক লোক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইত। তাদের কেউ আসত আর্থিক সাহায্যের জন্য, কেউ আসত সুপারিশের জন্য অথবা কোন কাজে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য। মনে হত, লোকগুলো যেন তাঁকে যাদুকর ভাবত। ভাবত, আইনস্টাইন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। সম্ভব হলে আইনস্টাইন এদের সাহায্য করতেন। কিন্তু তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করতেন না এবং ক্ষমতার বলে কাউকে শাসাতেন না।

দর্শনপ্রার্থীদের ভেতর অনেক সময় বিদেশী অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও থাকতেন। কিন্তু একজন নগণ্য লোককে আইনস্টাইন যেমন বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করতেন এঁদেরও ঠিক তেমনি অভ্যর্থনা করতেন। এলসা অন্তরালে থেকে দৃষ্টি রাখতেন এসব দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপার খুব দীর্ঘস্থায়ী যাতে না হয়।

গান-বাজনায় পারদর্শী ব্যক্তিরা সব সময়ই তাঁর কাছে বিশেষ সমাদর পেতেন। সব সময়ই তিনি তাঁদের আহবান করতেন তাঁর সঙ্গে একটিবার কনসার্টে যোগ দিতে। গান-বাজনা এবং দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ—এ দু'টি ব্যাপারেই তিনি আনন্দ পেতেন খুব বেশী।

পঞ্চাশৎ জন্মদিনের কিছু পূর্বে, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন কয়েকটি চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রকাশ করেন। কিছুদিন ধরে এসব নিয়েই তিনি চিন্তা করছিলেন। তাঁর এই নতুন মতবাদের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী'।

আবার দেশ-বিদেশের রিপোর্টাররা তাঁর কাছে আসতে লাগল সাক্ষাতের আশায়। বিজ্ঞানীর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে তারা এসব ছাপবে খুব নাটকীয়ভাবে ফলাও করে, সেই আনন্দে তাদের মন ভরপুর। কি চমৎকার সংবাদই না সেদিন কাগজে বের হবে!

আইনস্টাইন অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী নিয়ে লোকেদের এত মাথাব্যথা কেন? তারা সম্ভবত এর কিছুই বুঝতেও পারবে না। আপেক্ষিক মতবাদের চেয়েও যে এ জিনিসের ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাঁকে পূজার বস্তুতে পরিণত করার জন্য মানুষের এ জেদ দেখে তিনি বিস্ময়বোধ করলেন সবচেয়ে বেশি।

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, এ হট্টগোল থেকে বাঁচবার জন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবেন। জন্মদিনে তাঁরা সবাইকে লুকিয়ে চলে গেলেন হ্রদের ধারে একটি ছোট্ট বাড়ীতে। দিনটা নীরবেই কেটে গেল। আসবার সময় এলসা কিছু খাবার এনেছিলেন একটা টিফিন বাক্স ভর্তি করে। তাই দিয়েই সমাধা হল জন্মদিনের ভোজ। পুরানো ঢিলে পায়জামা আর বেমানান সোয়েটার পরা আইনস্টাইন খালি পায়ে হেঁটে বেড়ালেন মনের সুখে। তিনি মোজাগুলিকে মনে করতেন অপ্রয়োজনীয় অস্বস্তিকর জিনিস। এমন কি জুতো পায়ে দিতে না হলেও তিনি খুশী হতেন। এদিকে সারাদিন তাঁদের বাড়ীতে এসেছে অসংখ্য শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী আর উপহার। অসংখ্যলোক বাড়ীর দরজায় এসেছে শুভেচ্ছা জানাতে, অনেকে কাজ সেরেছে টেলিফোনের সাহায্যে।

এতদিনে আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, সাধারণ নাগরিকভাবে শান্ত জীবনযাপন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এখন যা কিছু তিনি বলেন, যা-কিছু করেন তাই সাধারণের কাছে আগ্রহের বস্তু। কিন্তু এসব অগ্রাহ্য করে চলবার মত মনোবল তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁর সৃজনশীল মন ছিল এসবের ঊর্ধ্বে।

আরও একটি বছর কাটল। আইনস্টাইন এক আমন্ত্রণ পেলেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজী তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে সেখানে তিন মাসের জন্য পরিদর্শক অধ্যাপক-রূপে কাজ করতে। দশ বছর আগে তিনি গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। দশ বছর পরের এই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করবেন স্থির করলেন।

নিউইয়র্কে গিয়ে একবার তিনি গেলেন হাডসন নদীর ধারে রিভারসাইড্ গীর্জা দেখতে। তখন সেখানকার প্রধান পাদ্রী ছিলেন ডঃ হ্যারি ইমারসন ফসডিক। তিনি আইনস্টাইনকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গীর্জার সবকিছু দেখাতে লাগলেন। প্রবেশদ্বারে এসে দু'জনেই তাঁরা কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন খিলানের দিকে। সেখানে রয়েছে মানবজাতির ইতিহাসে যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি-মূর্তি। রয়েছেন প্লেটো, বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়াস আর আইনস্টাইন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন দু'পাশের উঁচু জানালায় কাচে অঙ্কিত অতীতের সব মূর্তি দেখতে দেখতে।

ডঃ ফস্‌ডিক নিঃশব্দে বললেন, "ইতিহাসের বিখ্যাত ছয় শত লোকের প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে এখানে।"

আইনস্টাইন অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন ছবিগুলির দিকে। তারপর বললেন, "----এবং এঁদের ভেতর আমিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি ?"

"হ্যাঁ, তাই।"

এ সংক্ষিপ্ত জবাব আইনস্টাইনকে যেন ক্ষণকালের জন্য বিমর্ষ করে ফেলল। তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নতমস্তকে ধীরপদে বেরিয়ে এলেন।

সে রাত্রে আইনস্টাইন-দম্পতি গেলেন একটি অপেরা দেখতে। গীতবাদ্যপ্রিয় আইনস্টাইনের জন্যই এ আয়োজন। তাঁরা এসে আসন গ্রহণ করতেই দর্শকদের মধ্যে উঠল বিপুল হর্ষধ্বনি। বিস্মিত আইনস্টাইন কৌতূহলভরে চারদিকে চাইতে লাগলেন। দেখলেন তখনও যবনিকা উত্তোলন করতে বাকী। তবে এ হর্ষধ্বনি কিসের ?

"এসব তোমার জন্যই অ্যালবার্টলে। তোমাকে দেখে ওঁরা হর্ষধ্বনি করছেন !"

আইনস্টাইন অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন এলসার দিকে। তা' কেন হবে---কেন তারা তাঁকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠবে ? তিনি অবাক না হয়ে পারলেন না। এ রকম অযাচিত সম্মান মানুষ তাঁকে কেন দেয় তিনি ভেবে পেতেন না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। অর্কেস্ট্রা শুরু হবার আগের কয়েক মিনিট এমনি হর্ষধ্বনি আর হাততালিতে কাটল।

ক্যালিফোর্নিয়ার দিন কয়টি বেশ আনন্দেই কাটল। কাজেই পরের বছর শীতকালে আবার আসবেন বলে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

প্রথমবার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে এবং দ্বিতীয়বার যাবার আগে, ১৯৩২ এর বসন্তকালে আইনস্টাইন বার্লিনেই ছিলেন। দেশে তখন তুমুল হৈ চৈ। জার্মান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবার্গ দাঁড়িয়েছেন এডলফ্‌ হিটলারের বিপক্ষে। অবশেষে হিণ্ডেনবার্গেরই হল জয়।

হিণ্ডেনবার্গের জয়লাভে অনেকে কিন্তু মনে করল, এবার জার্মানীর যুদ্ধের মেশিন আবার চালু হবে। গণতান্ত্রিক জার্মান ক্রমশই দুর্বল

হয়ে পড়ছিল। আইনস্টাইন মনে অসোয়াস্তি ভোগ করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, জার্মানীর ক্ষুব্ধ ও নির্যাতিত জনগণ এবার হয়ত দলে দলে যোগদান করবে নাৎসী পার্টীতে। নাৎসী পার্টী ছিল তখনও ছোট এবং দুর্বল।

কিন্তু সে বছরের গ্রীষ্মকাল অবধি দেশের অবস্থায় কোন রকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল না। এদিকে আইনস্টাইনের পুনরায় ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। প্রয়োজনীয় ভিসার জন্য তিনি তাঁর পাসপোর্টটি পাঠিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কন্‌সালের বার্লিনস্থ অফিসে। আইনস্টাইনের এই পাসপোর্টে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

যাত্রার আগের দিন ভোরে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল ঘরে,—"কন্‌সাল অফিস থেকে বল্‌ছি। দয়া করে অধ্যাপক আইনস্টাইনকে খবর দিন, আজই ভোরে তিনি যেন একবার এই অফিসে আসেন।"

এলসা অবাক হয়ে গেলেন। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি এমন দরকার যে জন্য তোমাকে ডেকে পাঠাতেই হবে?"

তিনি ভাবছিলেন, তাঁর স্বামীকে ঠিক এমন ভাবে অনেকদিন কেউ ডেকে পাঠায় নি। তিনি স্বামীকে আবার বললেন, "যাকগে, তুমি যখন ব্যস্ত, আমিই বরং তোমার হয়ে দেখে আসি কি ব্যাপার।"

তাঁকে বাধা দিয়ে আইনস্টাইন বলে উঠলেন, "না, না, আমাকে ফোন করে থাকলে আমি নিজেই যাবো।"

তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মুষলধারায় ভিজতে ভিজতে আইনস্টাইন গিয়ে হাজির হলেন আমেরিকান কন্‌সাল অফিসে। তাঁর ঝাঁক্‌ড়া চুল বেয়ে তখনও বৃষ্টির পানি পড়ছিল ফোঁটায় ফোটায়।

একজন কেরানী একখানা আসন দেখিয়ে তাকে বসতে অনুরোধ করল। তারপর পেন্‌সিল হাতে নিয়ে একটি ফাইল খুল্‌তে খুল্‌তে বলল, "আপনি কি উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যাচ্ছেন?"

"তোমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি" আইনস্টাইন বললেন এবং একটু হেসে আবার বললেন, "তোমাদের দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েই যাচ্ছি।"

কেরানীটি ফাইলে কি যেন লিখে আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনার রাজনৈতিক সম্পর্ক কি?"

"রাজনৈতিক সম্পর্ক? আমার রাজনৈতিক সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই।" বলতে বলতে তিনি তাঁর উস্‌কো খুস্‌কো চুলের ভেতর হাতের আঙুল চালনা করতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি কোরানীটির দিকে চেয়ে রইলেন হতভম্বের মত। তারপরই সহসা উঠে পড়লেন।

"আমি এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে চাই না" নিম্ন অথচ বেশ দৃঢ়স্বরে তিনি কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন। তারপর আবার বললেন, "ভিসা দেবার ব্যাপারে যদি কোনো কথা ওঠে তবে আমার পক্ষে আমেরিকা না-যাওয়াই বরং ভাল"—বলেই দৃপ্ত পদক্ষেপে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আইনস্টাইন তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের সংকল্প ত্যাগ করেছেন,—খবরটা রাষ্ট্র হতেই বিকালে আলোড়ন সৃষ্টি হল বার্লিনস্থ আমেরিকান কূটনৈতিক মহলে। এক অফিস থেকে আরেক অফিসে সংবাদের আদান প্রদান হতে লাগল। টেলিগ্রাম ছুট্‌ল নানা দিকে। স্বয়ং চিফ্‌ কন্‌সাল এলেন আইনস্টাইনকে শান্ত করতে। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করলেন, ভিসা দেওয়ার জন্য এটা একটা মামুলী ব্যাপার। সন্দেহবশে তাঁকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে কিছুই করা হয় নি। এখনি ভিসা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পাসপোর্টও ফেরত পাঠান হবে লোক মারফত।

আইনস্টাইনের বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর সবাই খেতে বসেছে। স্বভাবত গম্ভীর আইনস্টাইনের মুখভাব সেদিন কঠিন। তিনি বলে উঠলেন, "আমাকে কেনো এভাবে অপরাধীর মত প্রশ্ন করা হবে? আমার জীবনের সব কিছুই তো তাদের জানা—সমস্ত গতিবিধিই তো তাদের চোখের সামনে। এ সবের প্রচার তো কম হয় নি। সবাই জানে, আমি কোথায় যাই, কি করি, কেমন করে হাঁটি, খাই-ই বা কি। কিছুই তো লুকানো নেই। তবু তারা ভাবছে, আমি কোন হীন কাজের ভার নিয়ে তাদের দেশে যাচ্ছি। এই যদি হয় তাদের ধারণা, তবে আর আমার আমেরিকা যাবার প্রয়োজন নেই।"

খাওয়া শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত আর কোনই কথা হল না। তারপর এলসার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, "আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা ঘটেছে নিশ্চয়ই কেরানীটির ভুলে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় যা ঝড় উঠেছে তাতে মনে হয় বেচারা কেরানী তার চাকরি খোয়াবে।"

আইনস্টাইনের প্রশস্ত ললাটে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল। এক মহূর্ত তিনি চিন্তিতভাবে চেয়ে রইলেন এলসার মুখের দিকে। তারপর চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো। আমার রাগের জন্য একটা লোককে কিছুতেই দুর্ভোগ ভুগতে দিতে পারি না। তোমরা খবরের কাগজের মারফত বলে দাও, আমরা আমাদের সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করছি না। কালই আমরা আমেরিকা যাত্রা করছি।"

পরের দিন ভোরবেলা। আইনস্টাইন এসে দাঁড়ালেন তাঁর পড়ার ঘরের দরজায়। আজ তাঁর ওভারকোটের বোতামগুলি পরিপাটি-ভাবেই লাগানো, মাথায় কাল হ্যাট। হ্যাটের তলা দিয়ে কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে তাঁর ধূসরপ্রায় চুলের গোছা। চোখের দৃষ্টি তাঁর ধীরভাবে ঘোরাফেরা করছে ঘরের ভেতর। ডেস্কের উপর নির্দিষ্ট জায়গায় তখনও পড়ে রয়েছে তাঁর পাইপটি, চেয়ারের উপরে রয়েছে তার সোয়েটার, আর রয়েছে মেঝে থেকে ছাদ অবধি তাকে সাজানো বইয়ের সারি।

আর কোনও দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করে ধীরে অথচ অটল পদক্ষেপে আইনস্টাইন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তারপর পার হয়ে এলেন ৫নং হ্যাবারল্যাণ্ডট্রাসী। জীবনে এ বাড়ীর সামনে আর তিনি কখনো আসতে পান নি।

পনেরো

সমৃদ্ধিশালী একটি বিশাল দেশ যুক্তরাষ্ট্র। চিন্তার ও কাজের অবাধ স্বাধীনতা সে দেশে। দেশের আমোদপ্রিয় জনগণের ভেতর অজানা সব কিছুকে জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তার ভেতর এসেও আইন-স্টাইনের সেবারের শীতকালটি বেশ শান্তিতেই কেটে গেল। ক্যাম-পাসের কাছেই ছোট্ট একটি বাড়ীতে তাঁরা আসতেন। দক্ষিণ ক্যালি-ফোর্নিয়ার সেই অঞ্চলে পরিষ্কার আলো-বাতাসের নিত্য আনাগোনা।

এমন নিমন্ত্রণ তাঁরা পেতেন যা প্রত্যাখ্যান না করে উপায় থাকত না। সকল বাড়ীরই মাননীয় অতিথি ছিলেন তিনি। গৃহকর্ত্রীরা তাদের ভোজসভায় তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। আইনস্টাইন এলসাকে বলতেন, "সব সময় চেষ্টা করবে এদের এড়িয়ে চলতে। এরা আমার সঙ্গ চায় না, চায় তাদের পার্টির মধ্য মণি করে রাখতে।"

ডাকের চিঠিপত্র তাঁর নামে আগের মতই আসতে লাগল গাদায় গাদায়। সেই সঙ্গে উপহার দ্রব্য। এর ভেতর অনেক জিনিসই থাকত নগণ্য যেমন, কোন স্কুলের একটি ছেলে হয়ত পাঠিয়েছে একটা জানোয়ারের মূর্তি যা সে তৈরী করেছে নিজ হাতে, কোন বেকার লোক হয়ত পাঠাত কিছুটা তামাক। তুচ্ছ হলেও এসব জিনিস পেয়ে আইনস্টাইন খুশী হতেন। কিন্তু অনেক দামী জিনিসও পাওয়া যেত। আইনস্টাইন সাধারণত সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। একবার কোন একজন ধনী শিল্পপতি তাঁকে পাঠালেন ত্রিশ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় একত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটা বেহালা। কিন্তু সে বেহালাটি তিনি ফেরত পাঠালেন। সঙ্গে লিখে পাঠালেন আপনার এ মূল্যবান যন্ত্রটি একজন সত্যিকার শিল্পীর ব্যবহার করা উচিত। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার পুরানো বেহালাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

এদিকে জার্মানীর ব্যাপার তখন সুবিধাব নয়। জার্মান রাইকের কর্ত্তা হয়েছেন তখন এডলফ হিটলার। অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি। তাঁর ঝটিকাবাহিনীর যেমনি সাহস তেমনি শক্তি। তাদের সাহায্যে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করা হিটলারের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল।

১৯৩৩ সালের মার্চে হিটলার হলেন জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বার্লিন ফেরার প্রাক্কালে আইনস্টাইন এ সংবাদ পেলেন। সংবাদ পেয়েই তিনি জার্মানীর সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তিনি ট্রেনে যাচ্ছিলেন নিউইয়র্ক। ট্রেন তখন ছুটে চলেছে নিউ জার্সীর ওপর দিয়ে। নিউ জার্সীর জলাভূমির উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছিল নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী হর্ম্যরাজি। ট্রেনের নির্জন কামরায় বসে আইনস্টাইন একমনে সে দিকেই চেয়েছিলেন।

অতি ধীরে কামরার দরজা খুলে গেল এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন এলসা। এসে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "অ্যালবার্ট, নিউইয়র্কের জার্মান কন্‌সাল্‌ এসেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে। এই যে তিনি।"

বলেই এলসা সরে দাঁড়ালেন কনসালকে কামরায় ঢুকতে দিয়ে। তারপর দরজাটি আবার ধীরে বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

"এই যে ডঃ সুয়ার্জ," বলে উঠলেন আইনস্টাইন, "একথা সত্যি যে আপনি নিউইয়র্কে জার্মান সরকারের প্রতিনিধি। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে আপনি ছিলেন বহুদিন ধরে আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু। কাজেই জার্মানীর অবস্থা আমাকে খোলাখুলি বলুন।" বলতে বলতে তাঁর স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, "আমার ধারণা বার্লিনে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

আইনস্টাইনের চোখের দিকে না চেয়ে কন্‌সাল বললেন, "আপনাকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাতেই আমি এসেছি, বন্ধু।" তিনি তাঁর গলা পরিষ্কার করে আবার বললেন, "যারা ঠিকভাবে চলেছে জার্মানীতে তাদের ভয়ের কোনই কারণ নেই। তার প্রতি বরাবর সুবিচারই করা হবে। আমি আপনাকে তাই ফিরে যাবার অনুরোধই করছি।"

আইনস্টাইন উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি জার্মানীর কীর্তিকলাপ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এবং জার্মানীতে এ ধরনের পাশবিকতা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন আর জার্মানীর মাটিতে পা ফেলব না।"

ডঃ সুয়ার্জও উঠে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তা'হলে আপনার সর্বশেষ মত? আমি তা'হলে পারলাম না আপনাকে সংকল্পচ্যুত করতে?"

আইনস্টাইন দৃঢ়তার সঙ্গেই মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, এই আমার চরম সিদ্ধান্ত।"

ডঃ সুয়ার্জ নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আইনস্টাইনের চোখের দিকে। তারপরেই বলে উঠলেন, "জার্মান কন্‌সাল হিসেবে আমার যেটুকু কর্তব্য ছিল তা আমি সমাধা করেছি কিন্তু আপনাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারি নি। সহসা হেসে উঠে তিনি আবার বললেন, "এবার একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এবং আপনার একজন

বন্ধু হিসেবে আমি বলতে বাধ্য যে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্তই করেছেন ফিরে যাওয়া আপনার পক্ষে সত্যিই নিরাপদ ছিল না।" বলতে বলতে তিনি আইনস্টাইনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন করতে।

নিউইয়র্কে আবার তেমনি ভিড় হল আইনস্টাইনকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু এবার তারা বিজ্ঞানীর মুখে লেগে থাকা সেই হাসিটি আর দেখতে পেল না। জার্মানীতে তাঁর জন্ম। আজ সেখানে যা ঘটছে তার চিন্তা তাঁকে অহরহ ব্যথিত করে তুলছে—বিশেষ করে' ইহুদীদের প্রতি সেখানে অকথ্য দুর্ব্যবহার চলছে বলে।

তিনি জানিয়ে দিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বেলজিয়াম যাত্রা করবেন। ইত্যবসরে যতটা সম্ভব তিনি জনসাধারণের কাছে হাজির হলেন দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত উপদ্রুত জার্মানীদের সাহায্যের জন্য। দলে দলে লোক আসতে লাগল তাদের প্রিয় বিজ্ঞানীকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে। তিনি যে একজন শান্তিকামী এবং শান্তির মধ্যেই মানুষের মহত্ত্ব, তাঁর এ মত তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

আইনস্টাইন দম্পতি যখন ইউরোপের পথে জাহাজে ছিলেন তখন শুনতে পেলেন, বিপক্ষে বিবৃতি দেওয়ায় নাৎসী সরকার আইনস্টাইনের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছে। সরকারের প্রতিনিধিরা জোর করে তাঁদের বাসস্থানে ঢুকে অনেক কিছু নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর ব্যাঙ্কের টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে। অবশ্য মূল্যবান কোনো জিনিস আইনস্টাইনের ছিলই না, তা'ছাড়া ছিল না অর্থের প্রতি কোনো লিপ্সা। ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যা জমা হয়েছিল তা' সম্ভব হয়েছে বুদ্ধিমতী এলসার চেষ্টায়। বেলজিয়ামে তাঁরা এসে পৌঁছলেন গৃহহীন কপর্দকহীন অবস্থায়।

আইনস্টাইন দম্পতির ভাগ্যে একটি কুটির জুটল সমুদ্রের তীরবর্তী এক গ্রামে। সেখানেই তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন। আইনস্টাইন আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন পুরো উদ্যমে। প্রথমেই তিনি ইস্তফাপত্র পাঠালেন প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এ। তিনি জানতেন যে কোনো দিনই তিনি সেখানে কার্যভার গ্রহণ করতে যাবেন না। কাজেই, তাঁর পুরানো বন্ধু ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ককে যাতে তাঁকে পদচ্যুত করতে না হয় তাই এই ব্যবস্থা করলেন তিনি।

এদিকে জার্মানীতে তখন শুরু হয়েছে ভয়াবহ চীৎকার। বার্লিনে ফিরে এলে তখন আইনস্টাইনের জীবন নাশের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ্যাকাডেমীর কাজে ইস্তফা দেওয়ায় তাঁকে সবাই বিশ্বাসঘাতক বলে গালাগালি দিতে লাগল। জার্মানীর সকল খবরের কাগজই তাঁর নামে বদনাম ছড়াতে লাগল মিথ্যাভাষী এবং দেশের শত্রু বলে। কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হল, ছবির নীচে লেখা হ'ল—'ফাঁসী হতে এখনও বাকি!'

এলসা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন, নাৎসীরা নিদয় প্রকৃতির লোক। ইতিমধ্যেই তাঁদের অনেক খ্যাতিসম্পন্ন বন্ধুকে জার্মানীতে হত্যা করা হয়েছে অতিশয় নির্মমভাবে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা জাতিতে ছিলেন ইহুদী। তা' ছাড়াও আইনস্টাইনের প্রতি নাৎসীদের ছিল জাতক্রোধ।

আইনস্টাইন নিজে কিন্তু এতটুকুও বিচলিত না হয়ে তখনও তাঁর কাজ করে চলেছেন অখণ্ড মনোযোগে। সময় সময় তিনি একাই বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন সমুদ্র পারে। চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করতেন সেখানে। এদিকে এলসা ব্যগ্র হয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তাঁকে ফিরে আসতে দেখা যেত।

বেলজিয়ামের রাজা ও রানী ছিলেন আইনস্টাইন-দম্পতির প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর মত একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে দেশে আশ্রয় দিতে পেরে তাঁরা খুশীই ছিলেন। আইনস্টাইন-দম্পতির সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তাঁদের একাধিক বারই হয়েছে। একবারের কথা তাঁদের মনে আসবে বরাবর। একদিন বিকালে রাজদম্পতি বিজ্ঞানীকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের রাজভবনে এক গানবাজনার আসরে। যথা সময়ে আইনস্টাইন তাঁর সাধের বেহালাটি বগল দাবা করে স্টেশন থেকে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে হাজির। ওদিকে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে রাজার মূল্যবান মোটর আর সেই সঙ্গে জরির উর্দিপরা দু'জন অনুচর। তাঁরা অতিথির প্রতীক্ষায় ছিল ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকটায় আর অতিথি ছিলেন তাঁর চিরপ্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়।

আজকের বিপদে কিন্তু রাজা ও রানী সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা জানতেন, নাৎসীরা আইনস্টাইনকে হাতে পাবার জন্য কম

করবে না। তার উপর বেলজিয়াম অবস্থিত জার্মানীর দুয়ারের অদূরে। এই নৃশংস প্রতিবেশীর হাত থেকে বেলজিয়ামের আশ্রিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব বেলজিয়ামবাসীর। রাজদম্পতি তাই চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আইনস্টাইনের গৃহের চতুর্দিকে পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করলেন। তা' ছাড়া আইনস্টাইনকে অবাক করে দিলেন সারাক্ষণ তাঁর অনুসরণ করবার জন্য একজন গোয়েন্দা নিয়োগ করে।

পাহারার ভার যাদের উপর, একাজে তাদের যথেষ্ট দক্ষতাই ছিল। একদিন আইনস্টাইনের পুরানো বন্ধু ডঃ ফিলিফ ফ্রাঙ্ক প্রাগ থেকে বেলজিয়ামে এসেছিলেন কোন এক কাজে। আইনস্টাইন দম্পতি কোথায় থাকেন তা' তাঁর জানাই ছিল। তিনি সেখানে যাত্রা করলেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গৃহের নিকটে যেতেই পিছন থেকে একজন লোক দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলল পিছমোড়া করে, আরেকজন এসে তাঁর পকেট তল্লাসী করতে লাগল। তারপর ঠিক সেই অবস্থায় ধরেই তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে হাজির করল আইনস্টাইনের গৃহের সামনে। এলসা সেখানে বসেছিলেন একখানা রকিং চেয়ারে। এ দৃশ্য চোখে পড়তেই তিনি দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ব্যাপার কি? ইনি কে?----কি হয়েছে?"

"ব্যস্ত হবেন না, ম্যাডাম। আমরা ঠিক সময়েই তাকে ধরে ফেলেছি। লোকটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল। ঘোরাফেরা করার সময় আমরা তাকে ধরেছি।"

এলসা ভাল করে চেয়ে বলে উঠলেন, "এযে দেখছি আমাদের অনেক কালের পুরানো বন্ধু ডঃ ফ্রাঙ্ক।"

লোক দু'টি একথা শুনেই তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিয়ে ভয়ে বলে উঠল, "মাফ করবেন, স্যার, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হয়ে চলব, স্যার।"

জামা কাপড় ঠিক করতে করতে অধ্যাপক হাসতে লাগলেন। বন্ধুকে এতটা সাবধানতার মধ্যে রাখা হয়েছে দেখে তিনি খুশীই হলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্টই বোঝা গেল যে, জার্মানীর সীমান্তবর্তী কোন দেশে আইনস্টাইনের জীবন আদৌ নিরাপদ নয়। যে আইনস্টাইনের নাম রয়েছে নাৎসীদের সন্দেহভাজন লোকদের তালিকায়, তাঁকে হত্যা করার জন্য যে-কোন ঘাতক সীমান্ত পার হয়ে দেশে ঢুকতে পারে।

অনেক দেশ থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল আইনস্টাইনের কাছে তাঁকে আশ্রয় এবং বাসস্থান দেবার প্রস্তাব নিয়ে। সে-সব জায়গায় তিনি যে নির্বিঘ্নে নিজের কাজ করে যেতে পারবেন তারও ভরসা দেওয়া হল। আমন্ত্রণ এল প্যারিসের সরবন থেকে আর এল মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় ও জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু আইনস্টাইন কোথায় যাবেন, তা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

নিউ জার্সী প্রদেশের প্রিন্সটন শহরে তখন তৈরী হচ্ছিল ইনস্টিটিউট ফর এ্যাডভান্স স্টাডী। এক বিত্তশালী পরিবারের অর্থ সাহায্যে এটি একটি অপূর্ব স্থান হবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে। কিছুকাল আগেই আইনস্টাইন এখানে এসে বছরের কিছু সময় কাজ করবেন বলে রাজী হয়েছিলেন। এবার তিনি স্থির করলেন স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য—যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যেই তিনি যাত্রা করবেন।

ইনস্টিটিউটের কাজে আইনস্টাইন স্থায়িভাবে আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ খুশী হয়ে উঠলো। চাকরির শর্ত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "বার্লিনের প্রুশিয়ান এ্যাকাডেমীতে যে বেতন আমি পেতাম এখানেও তাই পেলেই আমি খুশী।" কিন্তু বেতনের অঙ্কটা যখন কর্তৃপক্ষের কানে গেল, তখন তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, এত সামান্য বেতনে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কিছুতেই চলতে পারে না। তাঁরা আইনস্টাইনের বেতন ধার্য করলেন অনেক বাড়িয়ে। আইনস্টাইন বিস্মিত হয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই নিয়ে তাঁর নিয়োগের ব্যাপারে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। অবশেষে ও ব্যাপারের মীমাংসা করে দিল এলসা। স্থির হল, শরৎকালে আইনস্টাইন তাঁর নতুন চাকরিতে যোগদান করবেন।

ইউরোপ ছেড়ে তাঁর এবারের যাত্রা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল অতি সঙ্গোপনে। তাঁর নিজের কোন ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক, তা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। কাজেই, যাত্রার গোপন প্রস্তুতির কাজে তিনি পুরোপুরি সহযোগিতাই করলেন।

ছোট্ট একখানা নৌকায় করে আইনস্টাইনকে নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রগামী জাহাজে তুলে দিতে। আইনস্টাইন এগিয়ে চললেন শান্ত ও ধীরভাবে। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন এবারও কয়েকটি

বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করেছেন। তাই, তিনি একবার পিছন ফিরেও তাকালেন না।

নিউইয়র্ক উপসাগরে জাহাজ পৌঁছতেই আবার একখানা 'টাগ বোট' এসে তাঁকে গোপনে নিয়ে গেল তীরে। সেখানে গোপনেই একখানা গাড়ী অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। তারপর নির্বিঘ্নে এবং নিঃশব্দে তাঁকে নিয়ে পৌঁছান হল প্রিন্সটনে। তিনি তাঁর নতুন দেশে নতুন গৃহে এসে আশ্রয় নিলেন।

ষোল

নিউ জার্সীর অন্তর্গত প্রিন্সটন একটি ছোট শহর। শহরের বুক চিরে যে প্রধান রাস্তাটি বেরিয়ে গেছে তার নাম নাসাও স্ট্রীট। শহরের প্রধান রাস্তার দু'পাশে থাকে হরেক রকম দোকানপাট আর অফিস আদালতের ভিড়। কিন্তু নাসাও স্ট্রীটের দোকান-পাট সব একদিকে। রাস্তার আরেক দিকে লোহার কারুকার্যময় উঁচু বেড়া। বেড়ার ভেতরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্কের মতই সুদৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। বিশাল বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ও সুন্দর অট্টালিকা। সব কিছু মিলে প্রিন্সটন্ শহরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। নিউ জার্সীর অন্যান্য ছোট শহরের তুলনায় প্রিন্সটন সত্যিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পুস্তকের এত প্রকাণ্ড দোকান অপর কোন শহরে নেই, মিষ্টির এত দোকানও কোথাও নেই। সে সব দোকানে সারাক্ষণ ছাত্রদের ছোট ছোট দল বসে সোডা পান করতে করতে গল্প করছে। মোড় ঘুরেই একটি পুরানো জামা-কাপড়ের দোকান। নগদ অর্থের প্রয়োজন হলেই ছাত্ররা অনায়াসেই গিয়ে এখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাদের একটি জ্যাকেট বা প্যান্টের বিনিময়ে। একটি ফটোগ্রাফারের দোকানে যথারীতি সাজান রয়েছে শিশু ও নববিবাহিত দম্পতীদের ছবি এবং সেই সঙ্গে কতিপয় যুবকের ছবি। এসব ছবির মধ্যে অ্যালবার্ট আইন-স্টাইনের একটি প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি।

নাসাও স্ট্রীটের পাশে 'দি বল্‌ট' বলে একটি জায়গা। ছাত্রদের আনাগোনা খুব বেশী এখানে। ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে একদিন 'দি বলট' থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। থলের মত তাঁর পরিধানের পায়জামা। রবারের তলাওয়ালা জুতো পুরানো হয়ে ঠিক তার পায়েব আকার ধারণ করেছে। মাথায় চুলগুলো তাঁর বাতাসে উড়ছে। তিনি একটা ত্রিকোণাকার ঠোঙায় একটা আইসক্রীম খেতে খেতে যাচ্ছেন।

ইনি আইনস্টাইন। রাস্তা পার হয়ে প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন মার্সার স্ট্রীটের দিকে। অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁর ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্‌ স্টাডী থেকে বাড়ী ফিরতে পসন্দ করেন পায়ে হেঁটে। তাঁকে যেতে দেখে ছাত্ররা মৃদু হেসে তাঁকে অভিবাদন জানায় মাথা নত করে। এখন তিনি সকলরেই পরিচিত। কোন কোন সময় তাঁর সঙ্গে কিছু দূর অবধি আসেন কোন এক অধ্যাপক।

ছোট একটি সাদা বাড়ী আইনস্টাইনের। রাস্তার অন্যান্য বাড়ীর তুলনায় এ বাড়ীর সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। বাড়ীর দরজায় ঝুলছে আঙুর গাছের লতা। ঘরে ঢুকে বড় একটি জানালা খুলতেই চোখে পড়ে বাগান। বাড়ীটি শান্ত, নির্জন। অধিকাংশ সময় তাঁকে একলাই কাটাতে হয়। শুধু তাঁর খাওয়া-পরা আর কাজকর্ম দেখার জন্য একজন মহিলা সেক্রেটারী থাকতেন। এলসা প্রিন্সটনেই মারা গেছেন ১৯৩৬ সালে। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে নিকটেই গ্রামাঞ্চলের ছোট একটি গোরস্থানে।

প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের জীবন কাটছে নীরব শান্তির মধ্যে। বরাবর তিনি এরকম জীবনই কামনা করেছেন। এখানে নির্জনে থাকবার সুযোগও তিনি পেয়েছেন।

শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে প্রতিদিন ভোরে উঠেই তিনি বেড়াতে বের হন হেঁটে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান শহরের সীমান্তের দিকে। যত দূর এগিয়ে যান রাস্তায় বাড়ীঘরের সংখ্যা ততই কমতে থাকে। তার পরেই শুরু হয় খোলা মাঠ, মাঠের পরে প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা—ইনস্টিটিউট্‌ ফর অ্যাডভান্সড স্টাডী।

আইনস্টাইনের অফিস-কামরায় আসবাবপত্র খুবই কম। অফিসের কি কি আসবাব তাঁর দরকার প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়।

জবাবে তিনি বলেন, "আচ্ছা, দেখে বলছি। একখানা ব্ল্যাকবোর্ড আর চক, একটা ডেস্ক, খান কয়েক চেয়ার---কাগজ, পেন্সিল। ব্যস, এই যথেষ্ট। ও হ্যাঁ, ফালতু কাগজ ফেলবার একটা ঝুড়ি—একটু বড়ো দেখে।"

"একটু বেড়ো দেখে?"

তিনি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, একটু বড়ো দেখেই দেবেন। আমার ভুল খুব বেশী হয় কিনা।"

এ অফিসে তিনি সময় সময় একা বসেই কাজ করেন, কোন কোন সময়ে থাকেন তাঁর সহকারীদের দু'একজন। অনেক সময় উপরের শ্রেণীর জন কয়েক ছাত্রকে একত্র করে তিনি বক্তৃতা দেন। তাঁর সারা জীবনের এসব অভ্যাসের কোনই পরিবর্তন হয়নি। এখন তাঁর প্রত্যহ হেঁটে বেড়ানো এবং বিকেলে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘরে বসে গান-বাজনা করবার অভ্যাসটি বজায় আছে।

প্রিন্সটনে অনেক সময় তিনি কনসার্ট শুনতে যেতেন। তিনি গিয়ে ঢুকতেই দর্শকদের মধ্যে মৃদু চাঞ্চল্যের সঞ্চার হ'ত তিনি সে দিকে আদৌ লক্ষ্য করতেন না। মাথায় একরাশ চুলওয়ালা এই ভদ্রলোকের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে গান-বাজনায় পুরাপুরি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হত না।

একদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন স্থানীয় সিনেমায়। কৃচিৎ তিনি সিনেমা দেখতে আসতেন। সেদিন এসে-ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক এমিল জোলার জীবনীমূলক একখানা ছবি দেখানো হচ্ছিল বলে। তিনি টিকেট করে ভেতরে ঢুকে দেখলেন, হল একেবারে খালি। ছবি শুরু হবার প্রায় আধঘণ্টা আগেই তিনি এসে হাজির হয়েছেন।

তিনি তখন দারোয়ানকে বললেন, "আজকার বিকেলটি চমৎকার। একটু বাইরে ঘুরে সময় মত আবার আসব। আমার টিকিটখানা ফেরত চাই।"

দারোয়ান তাঁকে অভয় দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, স্যার। আপনি ফেরত এলে তখন আর টিকেট দেখাতে হবে না।"

আইনস্টাইন একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "কিন্তু---কিন্তু তুমি আমাকে মনে রাখবে কি করে?"

পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ এই লোকটির দিকে চেয়ে দারোয়ান হাসিমুখে বলল, "আপনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হবে না, স্যার।

আইনস্টাইন ছিলেন সত্যিকার বিনয়ী। অপর দশজনের তুলনায় তাঁর যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে একথা তিনি কখনও মানতে চাইতেন না। একবার তিনি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন অপর একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সঙ্গে। দর্শকরা থেকে থেকে হর্ষধ্বনি করে উঠছিল।

আইনস্টাইনের সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা এ রকম করছে কেন বলতে পারেন? এ চীৎকারের কারণটা আপনার জানা আছে?"

আইনস্টাইন ধীরে মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখেও জিজ্ঞাসার দৃষ্টি। তিনি বললেন, "আমিও সেই প্রশ্নই নিজকে করছি মনে মনে। এরা কেন এরকম করছে?"

আমেরিকার দিনগুলি তাঁর বেশ শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু যে সব দুর্গতদের তিনি জার্মানীতে ফেলে এসেছেন তাদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। বর্বর হিট্‌লার তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আইনস্টাইনের প্রিয় জন্মভূমি থেকে তখন অবিশ্বাস্য সব ভয়াবহ দুঃসংবাদ আসছিল দিনের পর দিন। যারা পেরেছে তারা সবাই জার্মানী ত্যাগ করে চলে এসেছে। কেউ এসেছে গোপনে পালিয়ে, কেউ রাত্রির অন্ধকারে ক্ষুদ্র নৌকায় চড়ে, কেউ বা কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে। যারা এভাবে পালিয়ে এসেছে তাদের অধিকাংশই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে আইনস্টাইনের কাছে। তাদের কেউ চেয়েছে পরামর্শ, কেউ সুপারিশপত্র, কেউ আর্থিক সাহায্য। বাস্তুত্যাগীদের চোখে তিনিই তাদের একমাত্র নেতা, এবং অভিভাবক।

দুর্দশাগ্রস্ত এসব লোকের দুঃখ অনুভব করবার শক্তি আইনস্টাইনের ছিল। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য তিনি যা করতে চাইতেন তা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। তবু কেউ কখনও ফিরে যায়নি তাঁর কাছে এসে। একবার তিনি কোন হাসপাতালে একটি মাত্র চাকরির জন্য সুপারিশ করে পাঠালেন চারজন প্রার্থীকে। একজনকে সুপারিশ করে বাকি সবাইকে তিনি বাদ দিতে পারেন না, কারণ সবাই তাঁর চোখে সমান।

আইনস্টাইনের বোন মায়া ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ১৯৩৯ সালে। মায়া তখন ইতালীতে বাস করতেন। যুদ্ধের ঝড়-

ঝাপটা তখন সেখানেও পৌঁছেচে। তিনি ভাইয়ের কাছে এসেছিলেন স্বাধীনতার শান্তি উপভোগ করতে। কারণ, শান্তি বলতে ইউরোপের কোথাও কিছু তখন অবশিষ্ট নেই।

এই মহিলাকে প্রথম প্রথম পথে চলাফেরা করতে দেখে প্রিন্সটনের লোকেরা বিস্মিত না-হয়ে পারেনি। আইনস্টাইনের চেহারার সঙ্গে কারো চেহারার এতটা মিল থাকতে পারে এটা সবার কাছেই অসম্ভব মনে হয়েছে। বোনের ছিল ভাইয়ের মতই অবাধ্য চুলের রাশ, তেমনি কথা বলার মৃদু ভঙ্গি। যে বিশাল প্রতিভাকে তারা দূর থেকে শ্রদ্ধা জানায় তাঁর চেহারার সঙ্গে এমন হুবহু মিল অথচ বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর এতোটুকু জ্ঞানও নেই।

একদিন, ১৯৩৯-এর অগাস্ট মাসের প্রথমদিকে দু'জন আগন্তুক এলো আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরাও দু'জন উদ্বাস্তু বিজ্ঞানী। ইয়োরোপে তখন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে গবেষণা চলছে তারই সংবাদ নিয়ে এসেছেন তাঁরা। পরমাণুর মধ্যে যে ভয়ানক শক্তি নিহিত রয়েছে তা কাজে লাগাবার সম্ভাবনার ব্যাপার ছিল তাঁদের আলোচ্য। আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে যে মতামত একটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন তার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক রয়েছে।

নির্জীবের মত বসে আইনস্টাইন তাঁদের কথা শুনলেন। তাঁরা কি বলছেন, আইনস্টাইনের তা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে একটুকুও বিলম্ব হল না। যাঁরা এ কাজ সমাধা করেছেন তাঁদেরও তিনি ভালভাবে চেনেন।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে ব্যস্তভাবে বললেন, "পরমাণু শক্তির মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে জার্মানরা বেশ সজাগ ডাঃ আইনস্টাইন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নিয়েই এতটা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন যে একাজের গবেষণা চালাবার উপযোগী লোক বা মালমসলা তাঁদের নেই। এ কাজ সমাধা করতে পারে শুধু আমেরিকা এবং তা করাও একান্ত কর্তব্য ; জার্মানী কিছু করবার আগেই তাদের করা উচিৎ। আমেরিকার আগেই যদি জার্মানী আণবিক অস্ত্রের সন্ধান পায়, তা' হলে---বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, এ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হতে আরও মাস কয়েক লাগবে। কাজ অবশ্যি আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা বাকি। সে সব খুব দ্রুত করতে হবে।"

আইনস্টাইন অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইলেন। তারপর বললেন, "এ কাজের গুরুত্ব আমি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি কি করতে পারি? গভর্ণমেন্টকে প্রথমেই জানাতে হবে।"

"হ্যাঁ, সেজন্যেই আমরা এসেছি আপনার কাছে। আমরা গভর্নমেন্ট অবধি পৌঁছতেও পারবো না, আমাদের কথায় কেউ কানও দেবে না। কিন্তু আপনি যদি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি মনোযোগ দেবেন।"

"মনোযোগ দেবেন---?" তিনি অনিশ্চয়তার দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, "আমার কথায় তিনি মনোযোগ দেবেন না।"

কথাটা তিনি সহজভাবেই বললেন এবং তাঁর বিশ্বাসও ছিল তাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কেন তাঁর কথা শুনতে রাজী হবেন? কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আগেও বহুবার যা করতে হয়েছে তাই করতে হল--- আইনস্টাইনকে তাঁর মতামতের গুরুত্ব বুঝিয়ে তাঁকে আত্মসচেতন করে তোলা হল। আগন্তুক দু'জন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর আইনস্টাইন ডেস্ক খুলে বের করলেন নিজের কলম আর একখানা কাগজ।

সেদিন তিনি যে চিঠিখানা প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে লিখলেন সে চিঠিই আণবিক যুগের সূচনা করেছে। এ চিঠির ফলেই কলের চাকা ঘুরতে লাগল ধীরে ও নিঃশব্দে কিন্তু নিশ্চিতরূপে।

এ ব্যাপারে সব কাজই চলতে লাগল বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাইরে সব কিছুই চলছিল এমন সহজভাবে যেন কোথাও কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছিল সকলের অলক্ষ্যে। প্রত্যক্ষভাবে যদিও আইনস্টাইন তেমন কিছু করেন নি তবু এ ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই সরকারের দায়িত্ব ছিল তাঁকে নিরাপদে রাখা। কিন্তু আইনস্টাইন শরীর-রক্ষী পছন্দ করতেন না, নিজের খেয়ালখুশী মত চলাফেরা ও কাজ-কর্ম করতে ভালবাসতেন। এজন্য তাঁর-খেয়াল খুশীর উপরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত—অন্ততঃ বাইরে থেকে তাই মনে হত।

আইনস্টাইনের নিরাপত্তার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা' গোপন রাখা আদৌ অসম্ভব ছিল না। তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম ছিল সুনির্দিষ্ট, কাজেই অন্যের পক্ষে তা' অনুমান করাও ছিল সহজসাধ্য।

কাউকে বলা-কওয়া নেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠিক করলেন, কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। সকালে খেতে খেতে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন, "আজ দুপুরে খাবার সময় আমি থাক্‌ছি না। দশটার ট্রেন ধরে আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি ফিরে আসব রাত্রির খাবার আগেই।"

সেক্রেটারী মহিলাটি মৃদু আপত্তি করে বললেন, "আপনার তো একলা যাওয়া উচিত হবে না। সঙ্গে যাবার জন্যে একজন কাউকে ঠিক করে দিচ্ছি।"

শুনে তিনি যেন ধৈর্যহারা হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমিও দেখছি অন্যান্য সবার মতই নটখটে লোক। আমার কোন সঙ্গীর দরকার নেই। আমি এতটুক পথ সচ্ছন্দে একলা যেতে পারবো।"

এই বলে তিনি যখন ঘর দেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন সেক্রেটারী ছুটে গেলেন টেলিফোনের ধারে।

এদিকে আইনস্টাইন ইন্‌স্টিটিউটের কাছে গিয়ে পেঁাছবার আগেই পিছনে শুনতে পেলেন দ্রুত পদধ্বনি।

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, "গুড মনিং ডঃ আইনস্টাইন।"

লোকটি তাঁর একজন সহকারী। তিনি প্রত্যাভিবাদন করে বলে উঠলেন, "এই ভোর বেলাই আপনাকে বডড ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি, ব্যাপার কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু ব্যস্তই রয়েছি। কারণ হল, দশটার ট্রেন ধরে আমাকে আজ একটিবার নিউইয়র্ক যেতেই হবে। তার আগে একটা কাজ সারতে হবে।"

"দশটার ট্রেন। আরে আমিও যে সে ট্রেনেই নিউইয়র্ক যাচ্ছি হে। কলম্বিয়া ইউনিভাসিটি তোমার যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?" সহকারী বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, "আমিও সেখানেই যাচ্ছি, স্যার। খুব ভাল হল আপনার সঙ্গী হবার সুযোগ পেয়ে।"

আইনস্টাইন সশব্দে হেসে উঠলেন, "হাঃ-হাঃ-হাঃ আমি একলা যাচ্ছি বলে ওদিকে আমার সেক্রেটারী ভেবেই আকুল। মেয়েটি একেবারে বোকা নয় কি ?"

"একদম বোকা মেয়ে।" সহকারী তাঁর কথায় সায় দিয়ে দুষ্টামীর হাসি হাসতে লাগল মুখ ফিরিয়ে।

সতেরো

৬ই অগাস্ট, ১৯৪৫ সাল। জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর সহসা দপ্ করে জ্বলে উঠল চোখ ঝল্সানো আলো। একদিক থেকে আরেক দিক অবধি ছড়িয়ে পড়ল সে আলো। ক্ষণকালের জন্য সব কিছু নীরব নিথর। তারপরেই বজ্রের মত পৃথিবী প্রকম্পিত করে নেমে এল প্রচণ্ড এক আঘাত। সে আঘাতে ঘর-বাড়ী, দালান কোঠা ভেঙে মুহূর্তে ধূলিস্মাৎ করে দিল; বড় বড় গাড়ীগুলিকে ভেঙে চুরমার করে দূরে ফেলে দিল ছেলেদের খেলনার মত। তার সেই ভয়াবহ উত্তাপ আশপাশের জীবন্ত সব কিছুকে এভাবে ঝলসে দিল যে তা আর চেনাই যায় না।

বিস্ফোরণ অনুভূত হল শুধু জাপানে কিন্তু এ ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করল দুনিয়ার সুদূর প্রান্তের লোকেরা অবধি। যুক্তরাষ্ট্র আণবিক শক্তি ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কার করল।

আইনস্টাইন শান্তভাবে বসে আছেন তাঁর ডেস্কের সামনে। প্রিন্সটনের তাঁর আরামপ্রদ পড়বার ঘরে। নানা রঙের অসংখ্য ফুল মাথা নেড়ে নেড়ে যেন প্রকাণ্ড জানালার পার্শ্বে নিবিষ্ট এই নির্বাক লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। গ্রীষ্মকালীন সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাঠে ঘাসের উপর, গাছের মাথায় দুলছে পাতা।

আইনস্টাইন কিন্তু বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন না। তাঁর মনশ্চক্ষে তখন ভেসে উঠেছিল আণবিক বোমায় জাপানের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেল তারই ভয়াবহ দৃশ্য। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি জানতেন সুদীর্ঘকাল পূর্বে তাঁরই একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ আণবিক শক্তির গবেষণার পথ খুলে দিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্টকে লিখিত তাঁর পত্রই আণবিক বোমার মূল।

একটি গুরু দায়িত্বভার এসে পড়ল বৃদ্ধ আইনস্টাইনের নত মস্তকে। চিন্তাশীল এই ক্লান্ত লোকটি তখনও আশা করছিলেন যে আণবিক শক্তিকে বিপথে চালিত করবার ভয়াবহ ফলের কথা তিনি দুনিয়ার সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন এবং তাদের প্ররোচিত করবেন পৃথিবীর কল্যাণের কাজে এ শক্তি ব্যবহার করতে। সর্বান্তকরণে তিনি সঙ্কল্প করলেন, তাঁর এ সাবধান বাণী মেনে চলতে তিনি আবেদন জানালেন দুনিয়ার প্রতি জনের কাছে।

আঠারো

ছোট একটি অসমান ব্ল্যাকবোর্ডের উপর গাণিতিক রেখা আঁক্তে আঁক্তে পদার্থবিদ্‌দের বিশেষ ধরনের নিজস্ব ভাষায় উপরিউক্ত কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন লোকটি অত্যন্ত নিম্ন স্বরে। এত নিম্নস্বরে এবং এতটা জার্মানীর ভাষার ভঙ্গিতে তিনি কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন যে তা বুঝবার জন্য শ্রোতাদের একাগ্রভাবে কান পেতে থাকতে হচ্ছিল।

শ্রোতাদের সংখ্যা সেদিন ত্রিশ জনের বেশী নয়। তাদের ভেতর কয়েক জন ছিল উপরের শ্রেণীর ছাত্র যারা শিক্ষকের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথা অখণ্ড মনোযোগে গ্রহণ করছিল। বাকি সবাই ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্, এসেছেন আশেপাশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অধ্যাপক আইনস্টাইন যখনই তাঁর "ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন বলে স্থির করতেন তা' কখনো প্রকাশ্যে জানিয়ে দেওয়া হত না বা বোর্ডেও নোটীশ লট্‌কানো হত না। তা কখনও করা হলে তা' হতে কৌতূহলী লোকের এত ভিড় হত যে, যে মুষ্টিমেয় ক'জন লোক সত্যিই তাঁর বক্তৃতা বুঝতে পারতেন এবং উপকৃত হতেন তাঁদের ঠাঁই হত না। কাজেই অত্যন্ত সন্তর্পণে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের গৃহে খবর জানান হতো—"ই চিহ্নিত কামরায় আজ বিকেলে তিনটার সময়।" দু' একবার টেলিফোন করা হতো এদিক ওদিক। তারপর

তিনটা বাজতে বাজতে সেই কামরাটি ভরে যেত এমন সব শ্রোতায় যাদের সেখানে রয়েছে সত্যিকার অধিকার।

আইনস্টাইন তাঁর বক্তৃতা শেষ করে শ্রোতাদের অভিবাদন জানিয়ে ধীরে কক্ষত্যাগ করলেন। দরজাটি বন্ধ হতেই ঘর ভরে উঠল নতুন শোনা মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনায়।

একজন পরিচারক এসে ঢুকল সেই কামারায়। যে দু'টি স্ক্রু দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডখানা আটকানো হয়েছিল দেওয়ালের সঙ্গে তা' আল্‌গা করে দিল। তারপর অতি সন্তর্পণে নামিয়ে নিল বোর্ডখানা। বোর্ডখানা সে এমনভাবে উঁচু করে নিয়ে গেল যাতে কোন কিছুর ঘষা লেগে একটি দাগও মুছে যেতে না পারে। চকের দাগগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বরাবরের জন্য বিখ্যাত এই বিজ্ঞান-বিদের হস্তাক্ষর সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

ইত্যবসরে আইনস্টাইন নীচের তলায় তাঁর অফিস কামরায় গিয়ে ঢুকেছেন। বিশেষ চেষ্টার পর চামড়ার তৈরী জ্যাকেটটা পরলেন, তারপরে পরলেন ভারী টুপিটা। তখন ১৯৫৫ সাল। কয়েক দিন আগেই তাঁর ৭৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। শরীরটা তাঁর কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না বলে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন শরৎকালের ভোর বেলায় একটি টুপি পরতে। তা' ছাড়া এ টুপিটা তাঁর ভারী পছন্দসই, কারণ মায়া তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন এটি নিজের হাতে বুনে।

একজন সহকারী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। দু'জনে বাড়ীর পথে মাঠে নেমে পড়লেন। যুবকটি হাঁটতে লাগল সঙ্গীর মন্থর গতির সঙ্গে তাল রেখে। এখন কোথাও এবং কেউ তাঁর সঙ্গী হলে অথবা ভারী টুপি মাথায় দিয়ে বের হতে বললে তিনি আর আপত্তি করেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন, আগের মত সুস্থ সবল তিনি আর নন। এখন অনেক দিন তাঁর বাইরে না-গিয়েও কেটে যায়।

রাস্তার মোড় ঘুরে তাঁরা দু'জন মার্সার স্ট্রীটে পড়তেই এক বাড়ী থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এল এক তরুণী। আইনস্টাইনের দিকে চেয়ে সে আনন্দে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালো। বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মুখ-চোখও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল মধুর হাসিতে। তিনিও হাত নেড়ে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। তরুণীটি বৃদ্ধের একজন বান্ধবী। অনেক দিন তার

অঙ্ক কষে দিতে হয়েছে বিজ্ঞানীকে। প্রিন্সটনের সবাই ছিল তাঁর বন্ধু। সবাই তাঁকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে যদিও তাঁর সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব ছিল অসীম।

আইনস্টাইন আগের চেয়ে আরও বেশী কাজ করতে লাগলেন। এদিকে দিন যত যেতে লাগল তিনি ততই দুর্বল হতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এপ্রিলের মাঝা-মাঝি সময়ে বিশেষ যত্ন-আত্তির জন্যে তাঁকে ঠাঁই দেওয়া হল প্রিন্সটন হাসপাতালে। সেখানে তিনি বেশ ভাল বোধ করতে লাগলেন। দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে তিনি খোশগল্প করতেন বন্ধুভাবে। হাসপাতালের লোকদের বিশেষ খাতির যত্নের পরিবর্তে তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

১৮ই এপ্রিল শেষ রাত্রির একটু পরেই নার্স অ্যালবার্ট রোজেল ঘুমন্ত বিজ্ঞানীর শয্যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, তিনি যেন শ্বাস ফেলতে কষ্ট বোধ করছেন। সে একজন ডাক্তার ডাকতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় কানে গেল জার্মান ভাষায় তাঁর রোগীর অতি মৃদু কণ্ঠস্বর। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এল শয্যাপার্শ্বে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী যিনি এমন সব জিনিস জানতেন যা ছিল দুনিয়ার অধিকাংশের কাছে অবোধ্য তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জীবনে আইনস্টাইন যা কিছু বলেছেন শ্রোতারা সর্বত্র তাই শ্রদ্ধা সহকারে শুনেছে এবং অমূল্য মনে করেছে তাঁর সেই বাণী। আজ তিনি উচ্চারণ করলেন তাঁর শেষ বাণী। কিন্তু মিস্ রোজেল জার্মান ভাষা বুঝতে পারলেন না। ভক্ত ও অনুসারীদের জন্য মহাবিজ্ঞানীর শেষ বাণীটি কি ছিল? কোন দিনই কেউ তা জানতে পারবে না।